সম্পূর্ণ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

যেসব কারণে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

সম্পাদনা

মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল

সম্পূর্ণ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

যেসব কারণে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

আরবি প্রভাষক :
আলহাজ্জ মোহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা
৮-৯ লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০

খতীব :
হাজির পুকুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

চেয়ারম্যান :
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

সম্পাদনা

মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা
কুরআন ও হাদীসের দলীলভিত্তিক সহীহ আকীদাহ সম্পন্ন বইয়ের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

সংকলনে
শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

সম্পাদনা :
মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল

প্রকাশকাল :
জুন ২০১৭ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব :
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ :
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

হাদিয়া : ১০০/- (একশত টাকা মাত্র)

সূচীপত্র

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

'যেসব কারণে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়' বইটি বের করতে পেরে মহান আল্লাহর অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে প্রথম হলো ঈমান। ঈমান যদি সঠিক হয় তবে অন্যান্য নেক আমল কাজে লাগবে। আর ঈমান যদি সঠিক না হয় তাহলে সারা জীবনের নেক আমল কোন কাজে লাগবে না। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। আবার এমন অনেক বিশ্বাস, কথা ও কাজ রয়েছে, যার ফলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্ম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা কেবল তাদের জন্যই এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা আন'আম- ৮২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যারা ঈমান আনার পর তাদের ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখবে তারাই হেদায়াত পাবে এবং পরকালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যারা ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করবে তারা হেদায়াত ও নিরাপত্তা পাবে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করলেও তারা নানাভাবে শিরকী কাজে লিপ্ত রয়েছে। এজন্য আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে এবং ঈমানকে হেফাযত করতে হবে। অধিকাংশ মানুষই ঈমান এবং শিরক সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না।

এ বইটিতে আমরা ঈমানের পরিচয়, ঈমান সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক, ঈমান ভঙ্গের কারণ এবং কুফর ও শিরকসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি পাঠকসমাজ বইটি পাঠ করে অনেক উপকৃত হবেন এবং নিজেদের ঈমানকে হেফাযত করতে পারবেন; ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পূর্ণ মুমিন হিসেবে কবুল করুন। আমীন ॥

বইটি প্রকাশনার কাজে যাদের সহযোগিতা রয়েছে এবং যেসব উলামায়ে কেরামের লেখনী থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যেন সকলকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং এ প্রচেষ্টাকে আমাদের সকলের জন্য পরকালে মুক্তির একটি অসীলা বানিয়ে দেন। আমীন ॥

মা'আস্সালাম

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমানের পরিচয়

اَلْاِيْمَانُ (আল ঈমান) এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর পারিভাষিক অর্থে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান হচ্ছে-

هُوَ التَّصْدِيْقُ الْجَازِمُ وَالْاِقْرَارُ الْكَامِلُ وَالْاِعْتِرَافُ التَّامُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالٰى وَرُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ وَاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَاسْتِحْقَاقِهٖ وَحْدَهُ الْعِبَادَةِ وَاطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِذٰلِكَ اِطْمِئْنَانًا تُرٰى اٰثَارُهٗ فِيْ سُلُوْكِ الْاِنْسَانِ وَ الْاِلْتِزَامُ بِاَوَامِرِ اللهِ تَعَالٰى وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيْهِ وَاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَقُبُوْلِ جَمِيْعِ مَا اَخْبَرَ بِهٖ عَنْ رَبِّهٖ جَلَّ وَعَلَا وَعَنْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَمِنَ الْاُمُوْرِ الْغَيْبِيَّةِ وَالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِجَمِيْعِ مُفْرَدَاتِ الدِّيْنِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهٗ بِالطَّاعَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيْمَا اَمَرَ بِهٖ وَالْكَفُّ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ وَزَجَرَ؛ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالطُّمَانِيْنَةُ لِكُلِّ ذٰلِكَ

ঈমান হচ্ছে, দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং নাম ও গুণাবলির পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদাতের একমাত্র উপযুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। আর এ স্বীকৃতি এমনভাবে দেয়া যে, অন্তরে তার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে এবং বান্দার কথাবার্তা ও আচরণে তা প্রকাশিত হয়। আর তাঁর যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা ও সকল আদেশ পালন করা এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী– এ কথার স্বীকৃতি দেয়া। তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে দ্বীনে ইসলাম সম্পর্কে, অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে, শরীয়াতের বিধিবিধান সম্পর্কে এবং দ্বীনের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা। তিনি যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যেসব পাপ থেকে নিষেধ করেছেন এবং শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর এসব বিধান পালনের ক্ষেত্রে বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা।[১]

---

১ আল ঈমান হাকীকাতুহু, খাওয়ারিমুহু ওয়া নায়াকিযুহু, আবদুর রহমান ইবনে সালেহ আল মাহমুদ, মাকতাবাতুশ শামেলা।

তিনটি কাজের সমন্বয়ে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে :

১. اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ (আত তাসদীকু বিল জানান) তথা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে সেসব বিষয়ের ব্যাপারে অন্তরে এ বিশ্বাস থাকবে যে, এ বিষয়গুলো একেবারে সত্য। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾

আর যে সত্য নিয়ে আসল এবং যারা সে সত্যকে বিশ্বাস করল, তারাই মুত্তাকী। (সূরা যুমার- ৩৩)

২. اَلْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ (আল ইকরারু বিল লিসান) তথা মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিকে যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে, সে বিষয়গুলোর উপর যখন সে আস্থা রাখবে তখন সে মুখেও বলবে যে, আমি এ বিষয়গুলো বিশ্বাস করি। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমেই তাকে মুমিন হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সে মুমিনদের দলভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾

তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আর মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণ তাদের রবের পক্ষ হতে যা প্রদত্ত হয়েছিলেন তার প্রতিও ঈমান এনেছি। আমরা নবীদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারা- ১৩৬)

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা আহকাফ- ১৩)

৩. اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ (আল 'আমালু বিল আরকান) তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি ঈমানের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মুখেও এর স্বীকৃতি দেবে তখন তার উপর এ দায়িত্ব বর্তাবে যে, সে ঈমানের সকল দাবি পূর্ণ করে চলবে। একজন ঈমানদারের কর্তব্য হলো,

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা আদেশ করেছেন সে তা বাস্তবায়ন করবে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। কোন ব্যক্তির মাঝে কেবল এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটলেই তাকে পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল ইবাদাতকেই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়। (সূরা বাকারা- ১৪৩)

অত্র আয়াতে ঈমান দ্বারা বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে যেসব সালাত আদায় করা হয়েছিল তাকে বুঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ঈমান নামে নামকরণ করেছেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সকল আমলই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় ঈমানের সাথে নেক আমলকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান এবং নেক আমল উভয়টিকেই শর্তারোপ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস, আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আর তারা কখনো জান্নাত থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার বাসনা করবে না। (সূরা কাহফ- ১০৭, ১০৮)

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ﴾

যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম এবং উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল অর্থাৎ জান্নাত। (সূরা রা'দ- ২৯)

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

এটাই সেই জান্নাত, যা তোমাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ তোমাদের অধিকারে দেয়া হয়েছে। (সূরা যুখরুফ- ৭২)

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য হলো, ঈমান ও ইসলাম যখন একসাথে আসে তখন ঈমান বিশ্বাস অর্থে এবং ইসলাম বাহ্যিক আমল অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ঈমান যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় ইসলামসহ ঈমান। অর্থাৎ এমন ঈমান, যার মধ্যে বিশ্বাস ও আনুগত্য উভয়টিই বিদ্যমান থাকবে। আর যখন ইসলাম এককভাবে ব্যবহৃত হয় তখন ঈমানসহ ইসলাম বুঝায়।

ঈমান বাড়ে ও কমে

ঈমান আনার পর তা জড়বস্তুর মতো এক অবস্থায় থাকে না। বান্দা যখন নেক আমল করতে থাকে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকে তখন তার ঈমান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ঈমানদারের আমলের অনুপাতে তাদের মর্যাদার কম-বেশি হয়ে থাকে। বিপরীতপক্ষে যখন সে আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে তখন তার ঈমান কমতে থাকে। এমনকি কোন কোন নাফরমানী এমন রয়েছে যে, যার কারণে তখন সে আর মুমিনই থাকে না। অর্থাৎ তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়।

ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্ত দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

নিশ্চয় মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে কম্পিত হয় এবং তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে থাকে। (সূরা আনফাল- ২)

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? (প্রকৃতপক্ষে) যারা মুমিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়। (সূরা তাওবা- ১২৪, ১২৫)

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾

আমি তোমার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হেদায়াত আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহফ- ১৩)

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾

যখন মুমিনরা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে দেখতে পেল তখন তারা বলে উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো আমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল। (সূরা আহযাব- ২২)

﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ﴾

তিনিই সেই সত্তা, যিনি মুমিনদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করেছেন, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়। (সূরা ফাতহ- ৪)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِطٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْخُذُ بِيَدِ النَّفَرِ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَيَقُوْلُ : تَعَالَوْا نُؤْمِنُ سَاعَةً تَعَالَوْا فَلْنَذْكُرَ اللهَ وَنَزْدَدْ اِيْمَانًا. تَعَالَوْا نَذْكُرْهُ بِطَاعَتِهٖ لَعَلَّهٗ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهٖ

ইবনে বাসেত (রহ.) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রহ.) কয়েকজন সাথির হাত ধরে বললেন, এসো– আমরা কতক্ষণ ঈমান আনয়ন করি। এসো আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি এবং আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাগফিরাত দ্বারা আমাদেরকে স্মরণ করবেন।[২]

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا بِهٖ اِيْمَانًا

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে থাকতাম। আর আমরা ছিলাম অল্প বয়সী যুবক। তখন আমরা কুরআন শিক্ষা করার পূর্বে ঈমান শিক্ষা করতাম। এভাবে আমরা ঈমান বৃদ্ধি করতাম।[৩]

ঈমান কমে যাওয়া সংক্রান্ত দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا﴾

তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, উপরন্তু আল্লাহ তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা- ১০)

এখানে মুনাফিকীকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহ মুনাফিকীর কারণে তাদের এ রোগ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মুনাফিকীর কারণে তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে এবং সেই ঈমানের স্থান মুনাফিকীর রোগ দখল করে নিয়েছে।

﴿قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ﴾

সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। আর তারা তাই বলে থাকে, যা তাদের অন্তরে নেই; তারা যে বিষয়ে গোপন করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত। (সূরা আলে ইমরান- ১৬৭)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরীর নিকটবর্তী ছিল। তার মানে হচ্ছে, ঐ দিন তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

---

[২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩১০৬৫।

[৩] ইবনে মাজাহ, হা/৬১।

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর তারাই প্রকৃত হেদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা আন'আম- ৮২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যারা ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত করবে না তারাই নিরাপত্তা পাবে এবং হেদায়াত লাভ করবে। এ থেকে বুঝা গেল, যদি কেউ ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত করে তবে সে এ পুরস্কার পাবে না। কারণ তার ঈমান কমে গেছে এবং দুর্বল হয়ে গেছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দকর্ম হতে দেখে, সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। আর যদি সে এতে অক্ষম হয় তবে সে যেন তার জিহ্বা দ্বারা এটাকে প্রতিহত করে। আর যদি সে এতেও অক্ষম হয় তবে সে যেন তার অন্তর দ্বারা এটাকে প্রতিহত করে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।[৪]

এ হাদীসে নবী ﷺ যা বললেন তা থেকে বুঝা গেল যে, অন্যায় কাজ প্রতিহতকারী যদি তার শক্তি দ্বারা অথবা জবান দ্বারা সামর্থ্য না রাখে এবং অন্তর দ্বারা তার প্রতিবাদ করে তবে সে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। সুতরাং ঈমানের স্তর অনেক সময় নীচে নেমে যায়। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهٗ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ. يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় চুরি করতে পারে না।

---

[৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৬; ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৪৬০; সুনানে বায়হাকী লি আবি বাকর, হা/২০৬৭৪)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর সূত্রে আবু বকর নামে একজন বর্ণনাকারী এ হাদীসের সঙ্গে আরো এতটুকু যোগ করেছেন যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে মূল্যবান বস্তু এভাবে ডাকাতি করতে পারে না যে, লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে আর সে ডাকাতি করে যাবে।[৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, উল্লেখিত পাপসমূহ করার সময় ব্যক্তি মুমিন থাকে না। অর্থাৎ তখন তার ঈমান তার থেকে সরে যায় অথবা কমে যায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি তার ঈমান শক্তিশালী থাকত তাহলে সে কখনোই এসব অন্যায় কাজে জড়িত হতে পারত না।

অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, বেশি বেশি নেক আমল করা, যাতে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। আর সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা, যাতে আমাদের ঈমান কমে না যায়।

যেসব কাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়

যেসব কাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

১. ইলমে দ্বীন অর্জন করা। কেননা যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করল সে ঈমান বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উপকরণ লাভ করল।

২. আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের পরিচয় জানা। কেননা আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় নিহিত আছে, যা অর্থসহ অনুধাবন করলে ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৩. কুরআন পাঠ করা এবং গবেষণা করা। আর এটা হলো ঈমান বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উপকরণ। কারণ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন নিয়ে গবেষণা করে সে এমন জ্ঞান লাভ করে, যা ঈমানকে বৃদ্ধি করে। কুরআনের জ্ঞান ছাড়া এটা কখনো সম্ভব হয় না।

৪. নবী ﷺ এর জীবনী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা তিনি ছিলেন সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। যে ব্যক্তি যতবেশি নবী ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে তার ঈমান ততবেশি বৃদ্ধি পাবে।

৫. আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা আসমান ও জমিন সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলার এমন অনেক আশ্চর্য ধরণের সৃষ্টি রয়েছে, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ তা'আলার কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।

---

[৫] সহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫।

৬. অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা এবং দু'আ করা। কেননা যিকির এবং দু'আ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি বড় মাধ্যম। আল্লাহর যিকির মুমিনের ঈমানকে সতেজ করে।

৭. অধিক হারে নফল ইবাদাত করা। কেননা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, যা ঈমান বৃদ্ধির সহায়ক।

৮. সত্যবাদী মুমিনদের চরিত্র অনুসরণ করা এবং তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেয়া। কেননা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জীবনী চর্চা করলে অন্তর নরম হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৯. মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

১০. যাবতীয় কুফর, শিরক, বিদ'আত এবং কবীরা গোনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা যে ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত হয় তার অন্তরে মরিচা পড়ে যায়, যা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

যেসব কারণে ঈমান কমে যায়

যেসব কাজের মাধ্যমে ঈমান কমে যায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

১. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। অর্থাৎ দ্বীনের বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করা।

২. অলসতা করা এবং দ্বীন থেকে দূরে সরে থাকা।

৩. পাপ ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়া।

৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

৫. দুনিয়ার সৌন্দর্যের দিকে বেশি আকৃষ্ট হওয়া।

৬. আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের মজলিসে বসা এবং তাদের সঙ্গী হওয়া।

৭. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ইত্যাদি।

ঈমানের স্বাদ

কখন ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায় তা নবী ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসবে এবং অন্য কাউকে ভালোবাসলেও আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে; আর ঈমান আনার পর সে কখনো ঈমান থেকে ফিরে যাবে না তখনই সে ঈমানের স্বাদ ভোগ করতে পারবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ . وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে :
(১) যার কাছে সকল জিনিস হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়,
(২) যে কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে এবং
(৩) যে ঈমান আনয়নের পর আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[৬]
অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।[৭]

ঈমানের লক্ষণ

ঈমানের অনেক লক্ষণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি লক্ষণ হলো, যখন কোন বান্দার চরিত্র এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার ভালো কাজ তাকে আনন্দ দেয়; আর সে কখনো অন্যায় কাজ করে ফেললে এটা তাকে কষ্ট দেয় তখনই তার মধ্যে ঈমান আছে বলে ধরে নেয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي اُمَامَةَ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কী অর্থাৎ ঈমানের আলামত কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দ দিলে আর খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগলে তুমি মুমিন।[৮]

---

[৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬।
[৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৬০; তিরমিযী, হা/২৬২৩।
[৮] মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৬৬।

অন্য এক হাদীসে নবী ﷺ মুমিনের আরো কয়েকটি আলামত উল্লেখ করেছেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ تَعَالٰى وَمَنَعَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاَحَبَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْكَحَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ

সাহল ইবনে মু'আজ (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করা থেকে বিরত থাকল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসল, আবার আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করল, সে যেন তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।[৯]

এ হাদীসে ৫টি আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. اَلْاِعْطَاءُ لِلّٰهِ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করা অর্থাৎ যে কোন ব্যয় করার সময় শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত করা। ব্যক্তিগত খরচ, পরিবারের খরচ এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের ক্ষেত্রেও শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিয়ত করা। কোন প্রকার সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করার লৌকিকতা অথবা দান করে খোঁটা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকা।

২. اَلْمَنْعُ لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ কোন জায়গায় খরচ করা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিরত থাকা। যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যয় করতে নিষেধ করেছেন সেসব ক্ষেত্রে ব্যয় না করা এবং অপচয় করা থেকে বিরত থাকা।

৩. اَلْحُبُّ لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অথবা কাউকে আল্লাহওয়ালা মনে করে অথবা আল্লাহ ভালোবাসতে নির্দেশ করেছেন বিধায় কাউকে ভালোবাসা।

৪. اَلْبُغْضُ لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা অর্থাৎ কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করা।

৫. اَلنِّكَاحُ لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিবাহ করা অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করা বা বিবাহ দেয়া। নেক সন্তান লাভের আশায়, হারাম কাজ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ পালনার্থে বিবাহ করা।

নিজের জন্য যা পছন্দ অন্য মুসলিমের জন্যও তা পছন্দ করা ঈমানের লক্ষণ :

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।[১০]

---

[৯] তিরমিযী, হা/২৫২১; আবু দাউদ, হা/৪৬৭৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৬১৭।

[১০] সহীহ বুখারী, হা/১৩।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ :

عَنْ اَنَسٍ ؓ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই।[১১]

ঈমানের শাখা

ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। আর সেগুলো নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের ৬০ অথবা ৭০ এর অধিক শাখাপ্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ) বলা। আর তার মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি অঙ্গ।[১২]

নবী ﷺ তিন প্রকার আমলেরই এক একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা যবানের আমল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল এবং লজ্জা হলো অন্তরের আমল।

ঈমানের উপকারিতা

ঈমানদাররা সর্বোত্তম সৃষ্টি :

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। (সূরা বায়্যিনাহ- ৭, ৮)

তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা :

﴿وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى﴾

যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চমর্যাদা। (সূরা ত্বা-হা- ৭৫)

---

[১১] সহীহ বুখারী, হা/১৫।

[১২] সহীহ মুসলিম, হা/১৬১; আবু দাউদ, হা/৪৬৭৮; তিরমিযী, হা/২৬১৪; নাসাঈ, হা/৫০০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৯১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৩৬১।

তাদের পুরস্কার হবে জান্নাত :

﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ﴾

হে আমার বান্দাগণ! যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তাও নেই। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, আজ তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে। (সূরা যুখরুফ- ৬৯, ৭০)

হাশরের ময়দানে তাদেরকে নূর দেয়া হবে :

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

সেদিন (কিয়ামতের দিন) মুমিন নর-নারীদেরকে দেখবে যে, তাদের অগ্রভাগে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর প্রবাহিত হচ্ছে। (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে; আর এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য। (সূরা হাদীদ- ১২)

ঈমানদাররা প্রকৃত সম্মানের অধিকারী :

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

(সকল) মান-সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহর, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরা মুনাফিকূন- ৮)

ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ :

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক; তিনি তাদেরকে অন্ধকারসমূহ হতে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত; তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারসমূহের দিকে নিয়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্বারা- ২৫৭)

এখানে অন্ধকার বলতে মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে বুঝানো হয়েছে। যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং নিজের শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে।

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ﴾

এটা এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহই তাদের অভিভাবক; নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। (সূরা মুহাম্মাদ- ১১)

আল্লাহ ঈমানদারদেরকে সাহায্য করেন :

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

আমার কর্তব্য হচ্ছে মুমিনদেরকে সাহায্য করা। (সূরা রূম- ৪৭)

আল্লাহ ঈমানদারদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন :

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

পরিশেষে আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে উদ্ধার করি। আর আমার দায়িত্ব হচ্ছে এভাবে মুমিনদেরকে উদ্ধার করা। (সূরা ইউনুস-১০৩)

ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করা হয় না :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (সূরা আলে ইমরান- ১৭১)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি এমন উত্তম আমলকারীদের আমল নষ্ট করি না। (সূরা কাহফ-৩০)

ঈমানের মর্যাদা ও পুরস্কারে নারী-পুরুষ সমান :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে মুমিন অবস্থায় যে-ই সৎকর্ম করবে অবশ্যই তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল-৯৭)

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে মুমিন অবস্থায় যে-ই সৎকর্ম করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুপরিমাণও যুলুম করা হবে না। (সূরা নিসা- ১২৪)

ঈমানদাররা পবিত্র জীবন লাভ করে :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে মুমিন অবস্থায় যে-ই সৎকর্ম করবে অবশ্যই তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল- ৯৭)

ঈমানদারদের মধ্যে আল্লাহ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা মারইয়াম- ৯৬)

ঈমানদাররা উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয় :

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ﴾

যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? (প্রকৃতপক্ষে) যারা মুমিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। (সূরা তাওবা- ১২)

ঈমানদারদের জন্য ফেরেশতাগণ সুসংবাদ প্রদান করেন :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে বলে- তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; বরং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হও। দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আমরাই তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এটা হলো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। (সূরা হা-মীম সাজদা, ৩০-৩২)

ঈমানদারদের জন্য ফেরেশতাগণ দু'আ করে :

﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾

যারা আরশ বহন করে আছে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা প্রশংসার সাথে তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি সকল কিছুকেই (আপনার) জ্ঞান ও রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। অতএব যারা আপনার পথের অনুসরণ করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন- ৭)

এখানে মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা এমন মর্যাদার অধিকারী যে, আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের সহযোগী। তারা তোমাদের প্রতি সমবেদনা পোষণ করে এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন, যা আসমান ও জমিনবাসীদেরকে পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

ঈমানদারের গুণাবলি

মুমিনদের অনেক গুণাবলি রয়েছে, যা দ্বারা তারা তাদের ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নিতে পারে। এসব গুণাবলির মধ্যে রয়েছে।

তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে :

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

মুমিনদের উক্তি তো এই– যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। মূলত তারাই সফলকাম। (সূরা নূর- ৫১)

তারা কেবল আল্লাহকেই ভয় করে :

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলকে বহিষ্কার করার জন্য সংকল্প করেছে? তারাই তো প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। (সূরা তাওবা- ১৩)

তারা বিতর্কের সমাধান করে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তাদের আনুগত্য করো, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপন করো; যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। আর এটাই উত্তম পন্থা ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা- ৫৯)

তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করবে। (সূরা আলে ইমরান- ১১০)

তারা পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনের সন্তান, সম্পদ ও নিজের উপর সর্বদা বিপদ আসতে থাকে। এমনকি শেষপর্যন্ত এভাবেই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। তখন তার আর কোন গোনাহ বাকি থাকে না।[১৩]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।[১৪]

মুমিন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।[১৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম। অতঃপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আগমন করলেন এবং তিনি নবী ﷺ কে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুমিন সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।[১৬]

মুমিন বাজে কথা বলে না এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস

[১৩] তিরমিযী, হা/২৩৯৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৯২৪।

[১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৭৬০৬; তিরমিযী, হা/২৩২৪; ইবনে মাজাহ, হা/৪১১৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৮৯।

[১৫] আবু দাউদ, হা/৪২৮২; তিরমিযী, হা/১১৬২; সুনানে বায়হাকী আল কুবরা, হা/২০৫৭২।

[১৬] ইবনে মাজাহ, হা/৪২৫৯।

রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে।[১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ يَطْوِيْ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبِ

মুমিনের মধ্যে অন্যান্য দোষ থাকতে পারে, তবে খিয়ানত এবং মিথ্যা থাকতে পারে না।[১৮]

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ أَرْبَعٍ : اِنِ ابْتُلِيَ صَبَرَ. وَاِنْ اُعْطِيَ شَكَرَ. وَاِنْ قَالَ صَدَقَ. وَاِنْ حَكَمَ عَدَلَ

মুমিন চারটি জিনিসের মধ্যে থাকে। ১. বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে। ২. কিছু পেলে শুকরিয়া আদায় করে। ৩. কথা বললে সত্য বলে এবং ৪. বিচার করলে ইনসাফ করে।[১৯]

ইমাম ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (রহ.) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ قَلِيْلُ الْكَلَامِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ. وَالْمُنَافِقُ كَثِيْرُ الْكَلَامِ قَلِيْلُ الْعَمَلِ؛ كَلَامُ الْمُؤْمِنِ حُكْمٌ. وَصَمْتُهُ تَفَكُّرٌ. وَنَظْرُهُ عِبَرٌ. وَعَمَلُهُ بِرٌّ

মুমিন কথা বলে কম, আমল করে বেশি। আর মুনাফিক কথা বলে বেশি, আমল করে কম। মুমিনের কথা হলো শিক্ষণীয়, তার নিরবতা হলো গবেষণা, তার দেখা হলো শিক্ষা লাভের জন্য এবং তার কাজ হলো সৎকর্ম।[২০]

মালিক ইবনে দিনার (রহ.) বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ اللُّؤْلُؤَةِ اَيْنَمَا كَانَتْ حُسْنُهَا مَعَهَا

মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো মনিমুক্তার সাথে। তা যেখানেই থাকে তার সৌন্দর্য তার সাথেই থাকে।[২১]

ওয়াহ্হাব ইবনে মুনব্বাহ (রহ.) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ يُخَالِطُ لِيَعْلَمَ. وَيَسْكُتُ لِيَسْلَمَ. وَيَتَكَلَّمُ لِيَفْهَمَ. وَيَخْلُوْ لِيَنْعَمَ

মুমিন ব্যক্তি কারো সাথে মিলিত হয় কিছু জানার জন্য, নিরব থাকে নিরাপদ থাকার জন্য, কথা বলে বুঝার জন্য এবং নির্জনতা অবলম্বন করে লাভবান হওয়ার জন্য।[২২]

---

[১৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হা/১৮২; আবু দাউদ, হা/৫১৫৩; ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৭২; সুনানে বায়হাকী আল কুবরা, হা/১৬৪৪০; তিরমিযী, হা/২৫০০; দারেমী, হা/২০৭৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৬২৬।

[১৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, পৃঃ ৩৫।

[১৯] হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইসফাহানি, ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃঃ।

[২০] হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইসফাহানি, ৮ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ।

[২১] হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইসফাহানি, ২য় খণ্ড, ৩৭৭ পৃঃ।

শাক্বীক ইবনে ইবরাহীম বালাকী (রহ.) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ مَشْغُوْلٌ بِخَصْلَتَيْنِ. وَالْمُنَافِقُ مَشْغُوْلٌ بِخَصْلَتَيْنِ : اَلْمُؤْمِنُ بِالْعِبَرِ وَالتَّفَكُّرِ. وَالْمُنَافِقُ بِالْحِرْصِ وَالْاَمَلِ

মুমিন দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং মুনাফিকও দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মুমিন থাকে শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যস্ত; আর মুনাফিক থাকে লোভ ও আশা নিয়ে ব্যস্ত।[২৩] এগুলো হলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও রহমানের বান্দাদের গুণাবলি। আমরা যদি মুক্তি ও সফলতা চাই তাহলে আমাদেরকেও এসব গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আরকানুল ঈমান

ঈমানের আরকান বা মৌলিক বিষয় হলো ৬টি :

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান।
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।
৩. আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
৫. পরকালের প্রতি ঈমান।
৬. তাকদীর বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾

রাসূল ঐ বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন, যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং ঈমানদাররাও (সেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করেছে)। তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (সূরা বাকারা- ২৮৫)

হাদীসে জিবরাঈলে বর্ণিত হয়েছে,

اَلْاِيْمَانُ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكِتَابِهٖ وَلِقَائِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهٖ

ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, পরকালে আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর বিশ্বাস স্থাপন করা আখিরাত ও তাকদীরের সকল বিষয়ের প্রতি।[২৪]

---

[২২] হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইসফাহানি, ৪র্থ খণ্ড, ৬৮ পৃ:।
[২৩] হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইসফাহানি, ৮ম খণ্ড, ৭১ পৃ:।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেকে যেভাবে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্বজগতের রব একমাত্র আল্লাহ। তিনি স্বীয় সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্মব্যবস্থাপনায় এক ও একক। তিনি রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাবান এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী। তিনি একাই যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা চান তার হুকুম করেন। তাঁরই হাতে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কর্মসমূহে কোন শরীক নেই। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার ইলাহ বা মাবুদ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার তিনিই রাখেন।

আল্লাহ আরশে আযীমে অবস্থান করেন :

আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর আরশে সমাসীন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

﴿اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى﴾

দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন। (সূরা ত্বা-হা- ৫)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দাসিকে জিজ্ঞেস করলেন, اَيْنَ اللهُ তথা আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিল, فِى السَّمَاءِ আকাশে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাসিটিকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ اَنَا তথা আমি কে? সে উত্তর দিল, أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ আপনি আল্লাহর রাসূল। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাসির মালিককে বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও; নিশ্চয় সে একজন ঈমানদার।[২৫]

আল্লাহ স্বীয় আরশের উপর বিরাজমান রয়েছেন, যেভাবে তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে শোভা পায় সেভাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন,

اِسْتِوَائُهُ مَعْلُوْمٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُوْلٌ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ

অর্থাৎ আল্লাহর সমাসীন হওয়াটা জানা যায়, কিন্তু তার সমাসীন হওয়ার পদ্ধতি অজানা। আর এ বিষয়ের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।[২৬]

আল্লাহ মানুষের সাথে থাকার মর্মার্থ :

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে রয়েছেন। যেমন–

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ اَيۡنَ مَا كُنۡتُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (জানার দিক দিয়ে) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ- ৪)

---

[২৪] সহীহ মুসলিম, হা/১০৮ (হাদীসে জিবরাঈল)।

[২৫] সহীহ মুসলিম, হা/১২২৭; আবু দাউদ, হা/৯৩১; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৭৬৫।

[২৬] ওসিয়্যাতু আবী উসমান লিস সাবূনী; আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১৪২।

﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

যখন তারা উভয়ে (একটি) গুহার মধ্যে অবস্থান করছিল তখন তিনি তার সঙ্গীকে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা তাওবা- ৪০)

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকার দুটি দিক রয়েছে। তা হলো :

১. اَلْمَعِيَّةُ الْعَامَّةُ বা সাধারণ সাথিত্ব। এটি সকল সৃষ্টিকেই শামিল করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও বেষ্টনির ক্ষেত্রে সকল কিছুর সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও বেষ্টনির বাইরে নেই। কোন কিছুই তাঁর থেকে অদৃশ্য হতে পারে না।

২. اَلْمَعِيَّةُ الْخَاصَّةُ বা বিশেষ সাথিত্ব, যা তাঁর রাসূল ও সৎকর্মশীলগণের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। এ সাথিত্বের অর্থ হলো, তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন ও ভালোবাসেন। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় সাওর গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর গুহামুখে কাফিরদের আগমনে আবু বকর (রাঃ) কে বিচলিত দেখে বলেছিলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থাৎ তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।[২৭] এ সাথিত্ব এ প্রকার সাথিত্বকে বুঝিয়ে থাকে। এ জাতীয় বাক্যগুলো সাহায্য-সহানুভূতি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ নিরাকার নন :

কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহর চেহারা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদির কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর আকৃতি কিরূপ তা বলা হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর মর্যাদার সাথে যেভাবে মানানসই সেভাবেই আছে। আল্লাহর এসব গুণের কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাবে না এবং কোন উপমাও দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

কোনকিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা- ১১)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন রকম উপমা পেশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন; তোমরা জান না। (সূরা নাহল- ৭৪)

আল্লাহর চেহারা আছে এর দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার মহিমাময় ও মহানুভব প্রতিপালকের চেহারা। (সূরা আর রহমান- ২৬, ২৭)

[২৭] সূরা তাওবা- ৪০।

আল্লাহর চোখ আছে এর দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করো; কেননা তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। (সূরা তূর- ৪৮)

আল্লাহর হাত আছে এর দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾

আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, নাকি তুমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীলদের একজন? (সূরা সোয়াদ- ৭৫)

আল্লাহর পা আছে এর দলিল : হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ ﴿ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴾ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهٗ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নাম বলতে থাকবে 'আরো কিছু আছে কি?' শেষপর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তাঁর পা রাখবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট। তখন তার এক অংশ অপর অংশের সাথে লেগে যেতে থাকবে।[২৮]

দুনিয়াতে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারে না :

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, অসীম। আর মাখলুক সসীম। মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সবকিছুই সীমিত। সীমিত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অসীম আল্লাহকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

কোন চোখই তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন। আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী এবং সব খবর রাখেন। (সূরা আন'আম- ১০৩)

মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু পারেননি। কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[২৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৬১; সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৫৬; তিরমিযী, হা/৩০৭২।

মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখতে চাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনই দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, সেটা যদি স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আ'রাফ- ১৪৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এ পৃথিবীতে মানুষের চর্ম চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। তবে আখিরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে বলে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। তখন আল্লাহ বান্দাকে দেখার শক্তি দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ﴾

যারা মঙ্গলময় কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক (মঙ্গল)। (সূরা ইউনুস- ২৬)

এ আয়াতে 'আরো বেশি' বলতে আল্লাহর সাক্ষাতকেই বুঝানো হয়েছে।

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ﴾

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও? তাহলে আমি তোমাদেরকে তা দিতে পারি। তখন জান্নাতীগণ বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? (সুতরাং আমরা আর কী চাইব?) তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলবেন। জান্নাতের যতসব নিয়ামত তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নিয়ামত হবে আল্লাহর দর্শন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো– যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরো বেশি।[২৯]

---

[২৯] সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৭।

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্ট জীব, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস। তারা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কোন কাজ করেন না।

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি :

আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু হতে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩০]

ফেরেশতাদের সংখ্যা :

ফেরেশতাদের সংখ্যা অত্যধিক। তাদের প্রকৃত পরিসংখ্যান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। কুরআনে এসেছে,

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ﴾

আর তোমার প্রতিপালকের বাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। (সূরা মুদ্দাসসির- ৩১)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ . يَدْخُلُهٗ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ . ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সপ্তম আকাশে বায়তুল মামুরে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফেরেশতা প্রত্যহ প্রবেশ করে। তারপর (আধিক্যের কারণে যারা একবার প্রবেশ করে) তাদের কেউ দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পায় না।[৩১]

অন্য হাদীসে রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا

---

[৩০] সহীহ মুসলিম, হা/৭৬৮৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫১৯৪।

[৩১] সহীহ মুসলিম, হা/৪২৯।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামকে এভাবে উপস্থিত করা হবে। সেদিন তাতে ৭০ হাজার লাগাম লাগানো থাকবে। প্রতিটি লাগামের সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে তাঁরা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।[৩২]

প্রধান প্রধান কয়েকজন ফেরেশতা :

১। **জিবরাঈল (আঃ),** যিনি আল্লাহর বাণী রাসূলগণের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন।

২। **মীকাঈল (আঃ),** যিনি আল্লাহর আদেশে জীবিকা বণ্টন করে থাকেন।

৩। **মালাকুল মাওত (আঃ),** যিনি জীবের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

৪। **ইসরাফীল (আঃ),** আল্লাহর আদেশ পেলে তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। আর তখনই কিয়ামত আরম্ভ হবে।

৫। **কিরামান কাতিবীন :** মানুষের দৈনন্দিন ভালো-মন্দ কার্য লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

৬। **মুনকার-নাকীর :** কবরে মৃত ব্যক্তিকে তার মাবুদ, রাসূল ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য :

১. আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।
২. আল্লাহ ফেরেশতাদের জন্য দুই, তিন ও চার বা ততোধিক ডানা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
৩. তাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তারা বিবাহ করেন না, তাদের সন্তানও হয় না।
৪. ফেরেশতারা অন্তরবিশিষ্ট ও জ্ঞানী।
৫. তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়াও অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
৬. তারা অক্লান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদা রত থাকেন।

ফেরেশতাদের কার্যাবলি :

ফেরেশতারা আল্লাহর গুণগান করে ও আরশ বহন করে :

﴿اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ﴾

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা প্রশংসার সাথে তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা মু'মিন- ৭)

ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদাতে ক্লান্ত হয় না :

﴿وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (সূরা আম্বিয়া- ১৯)

---

[৩২] সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৪৩; তিরমিযী, হা/২৫৭৩।

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর ইবাদাত হতে বিমুখ হয় না, বরং তারা তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সিজদাবনত হয়। (সূরা আ'রাফ- ২০৬)

ফেরেশতারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে :

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

তারা দিনে ও রাত্রে (সর্বদায়) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা এতে শৈথিল্য করে না। (সূরা আম্বিয়া- ২০)

ফেরেশতারা আল্লাহর জন্য সিজদা করে :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

আকাশমণ্ডলী ও জমিনের মধ্যে যেসব জীবজন্তু আছে সকলেই আল্লাহকে সিজদা করে। আর ফেরেশতাগণও (তাঁকে সিজদা করে) এবং তারা অহংকার করে না। (সূরা নাহল- ৪৯)

আল্লাহ ফেরেশতাদের দ্বারা মানুষকে সাহায্য করেন :

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব। (সূরা আনফাল- ৯)

মৃত্যুর ফেরেশতা প্রাণীর জান কবজ করে :

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

আপনি বলে দিন, তোমাদের (জীবন হরণের) দায়িত্বে নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জীবন হরণ করবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা সাজদা- ১১)

তাছাড়াও ফেরেশতারা রাসূলগণের উপর অহী অবতীর্ণ করার দায়িত্ব পালন করেন। বৃষ্টিবর্ষণ ও মেঘ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। আদম সন্তানকে হেফাযত করার দায়িত্ব পালন করেন। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করেন। জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। তারা মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। তারা জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদারী করেন। তারা শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব পালন করবেন।

মানুষের যাবতীয় আমল সংরক্ষণের জন্য সর্বদা দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন :

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

দুই গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা কাফ- ১৭, ১৮)

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

অবশ্যই তোমাদের জন্য নিয়োজিত রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ ও সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

ফেরেশতাদের ব্যাপারে করণীয় :

ফেরেশতারা যা অপছন্দ করেন তা হতে দূরে থাকতে হবে। কারণ আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায় তারাও তাতে কষ্ট পান।

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় ফেরেশতারা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যাতে কুকুর ও ছবি রয়েছে।[৩৩]

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, তাতে কোন পুণ্য নেই। বরং পুণ্য রয়েছে তার মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। (সূরা বাক্বারা- ১৭৭)

যে ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করে সে পথভ্রষ্ট হবে :

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা নিসা- ১৩৬)

ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা করা কুফরী :

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ, জিবরাঈল এবং মিকাঈলের সাথে শত্রুতা করে, নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু। (সূরা বাক্বারা- ৯৮)

---

[৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৩২২; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৬; তিরমিযী, হা/২৮০৪; ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৪৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৭৫৫; সুনানে নাসাঈ, হা/৫৩৬২;

৩. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের উপর যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে। যে ব্যক্তি তার কিতাবসমূহ অথবা তাঁর কোন কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর, তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করো। (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে অস্বীকার করবে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা নিসা- ১৩৬)

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নবী ও রাসূলগণের উপর ধর্মগ্রন্থ বা কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবের মধ্যে চারটি কিতাব প্রসিদ্ধ। যথা :

১। তাওরাত- মূসা (আঃ) এর উপর।

২। যাবুর- দাউদ (আঃ) এর উপর।

৩। ইঞ্জিল- ঈসা (আঃ) এর উপর।

৪। কুরআন- মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল হয়েছে।

আল-কুরআনের উপর যেমন বিশ্বাস করতে হবে, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবগুলোর উপরও অনুরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও সহীফা নবী ও রাসূলগণের মৃত্যুর পর বিলুপ্ত অথবা বিকৃত হয়ে গেছে। যেহেতু কুরআন মাজীদ রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন সেহেতু কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। আল কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং তাতে যে জ্ঞান রয়েছে তা সর্ববিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি। আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের সমাপ্তি ঘটেছে। সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে হেফাযত করবেন। আল কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

এটা এমন বাণী, যা মিথ্যা রচনা নয়। বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবে যা আছে তার সমর্থক এবং মুমিনদের জন্য সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত। (সূরা ইউসুফ- ১১১)

পূর্ববতী কিতাবে যে বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরীয়াতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন মূসা ও ইবরাহীম (আঃ) এর সহীফার কিছু কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى - إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى - صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾

কিন্তু তোমরা তো পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে। (সূরা আ'লা- ১৬)

কুরআন নাযিলের মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য তিনটি।

১. কুরআন তিলাওয়াত করা।

২. কুরআনের বিষয়সমূহ বুঝা।

৩. কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

সুতরাং কুরআনের প্রতি সার্বিকভাবে ঈমানের অর্থ হলো, কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে অনেক নবী ও রাসূল পাঠিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এ দুজনের মধ্যখানে আল্লাহ তা'আলা আরো অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন, সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিতেন, সৎকাজের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ তা'আলা সকল রাসূলকে তাঁর রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা হেদায়াত পেয়েছে। আর যারা তাদের অনুসরণ করেনি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের নিকট যেসব কিতাব পাঠিয়েছিলেন তারা তা প্রচার করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারা আল্লাহর বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি এবং কোন বিধান গোপনও রাখেননি। কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়াও আরো অনেক রাসূল ছিলেন, যাদের নাম ও পরিচয় আমরা জানি না। যত নবী ও রাসূল আগমন করেছিলেন, সকলের প্রতি ঈমান আনা জরুরি।

নবী-রাসূলগণ গায়েব জানতেন না :

রাসূলগণ মানুষ ছিলেন, তারা গায়েব জানতেন না। গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। গায়েবের যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে

নবী-রাসূলদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তারা কেবল ততটুকুই জানতেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বকরীর গোশতের সাথে বিশ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি ঐ বিষ মিশ্রিত খাবার কখনো খেতেন না। যেমন হাদীসে রয়েছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ইয়াহুদি মহিলা বিষ মিশ্রিত ছাগল নিয়ে আসলে নবী ﷺ তা হতে খেলেন। অতঃপর ঐ মহিলাকে ধরে আনা হলো এবং বলা হলো, আমরা কি তাকে হত্যা করব? তখন তিনি বললেন, না। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেছেন, (এরপর থেকে) আমি নবী ﷺ এর (মুখের) তালুতে বিষক্রিয়ার আলামত বরাবরই লক্ষ্য করতাম।।[৩৪]

রাসূলগণকে মুজিযা দেয়া হয়েছিল :

রাসূলগণ যে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্য বিভিন্ন রাসূলকে বিভিন্ন মুজিযা দান করেছেন। এসব মুজিযা হলো এমন অলৌকিক বিষয়, যা রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে সংঘটিত করা সম্ভব নয়। যেমন হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, বগল থেকে হাত বের করলে হাত সাদা হওয়া, আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করা, মুহাম্মাদ ﷺ এর কুরআনপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

নবী-রাসূলগণ মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন :

সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং তারা মাটির তৈরি ছিলেন। এমনকি আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺও মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। সকল মানুষ যেভাবে পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও ঠিক তেমনিভাবে জন্মগহণ করেছেন। অন্যান্য মানুষের যেভাবে বংশধারা আছে তাঁরও তেমন বংশধারা আছে। তার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন, বাজারে যেতেন। মানুষ মাটির তৈরি– এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۚ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বললেন, 'হও' এতে তিনি হয়ে গেছেন। (সূরা আলে ইমরান- ৫৯)

রাসূলগণ সব জায়গায় হাযির-নাযির থাকেন না :

অনেকের ধারণা রাসূলগণ বিভিন্ন জায়গায় হাযির হন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ আকীদা পোষণকারীরা মিলাদ পড়তে যেয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায়, অথচ নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবীরা তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক- এটা তিনি পছন্দ করতেন না। হাদীসে এসেছে,

---

[৩৪] সহীহ বুখারী, হা/২৬১৭; মুসলিম, হা/৫৮৩৪।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْا مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আর কারো ছিল না। তারপরও যখন তারা নবী ﷺ কে দেখতেন, তখন দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, নবী ﷺ এটা পছন্দ করতেন না।[৩৫]

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম একটি রুকন। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। যে ব্যক্তি আখিরাতকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরের আযাব ও শান্তি, পুনরুত্থান, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা, হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, দাড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত, ডান অথবা বাম হাতে আমলনামা বিতরণ, প্রতিফল প্রদান, হাউজে কাউসার, জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহর সাক্ষাৎ– এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা বাকারা- ৪)

পার্থিব জীবন শেষে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখনই তার পরকাল শুরু হয়ে যায়। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষের দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং আখিরাতের দিকে পা বাড়ায়। মৃত্যুর সাথে সাথেই ব্যক্তির সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং পরজীবনের সুখ অথবা শাস্তি পেতে আরম্ভ করে।[৩৬]

মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যায় :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ﴾

প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আনকাবূত- ৫৭)

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

১. مَنْ رَّبُّكَ অর্থাৎ তোমার রব কে?

২. وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার দ্বীন কী?

৩. وَمَنْ نَّبِيُّكَ অর্থাৎ তোমার নবী কে ছিলেন?

---

[৩৫] তিরমিযী, হা/২৭৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৩৪৫।

[৩৬] সূনানে দারেমী, হা/২২৬।

অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আল্লাহ সত্যের উপর অটল রাখবেন এবং তারা সঠিকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে। আর যারা কাফির ও মুনাফিক তারা কিছুই বলতে পারবে না। বরং তারা বলবে, হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না।

আমল অনুযায়ী কবরের শান্তি অথবা শাস্তি হবে :

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরের ধাপগুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে না তার জন্য এর পরের ধাপগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে।

যদি মৃত ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয় অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয় অথবা হিংস্র পশু-পাখি খেয়ে ফেলে তবুও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ ... إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِيْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ أَسْمَعُ مِنْهُ

যায়েদ ইবনে সাবেত ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় এ জাতি (মানবজাতি) কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। যদি তোমরা (তাদেরকে) দাফন করবে না বলে আশংকা না করতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, যা আমি শুনতে পাই।[৩৭]

কিয়ামতের আলামত :

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে পরকাল শুরু হবে। তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কিয়ামতের লক্ষণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১. عَلَامَةُ الصُّغْرٰى তথা ছোট আলামত। ২. عَلَامَةُ الْكُبْرٰى তথা বড় আলামত।

১. ছোট আলামত : যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়। এগুলো অনেক রয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলো সংঘটিত হয়ে গেছে। যেমন–

১. শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমন হওয়া।
২. আমানতের খিয়ানত করা।
৩. মসজিদ অধিক মাত্রায় সাজ-সজ্জা করা ও তা নিয়ে গর্ব করা।
৪. রাখাল ও নিম্ন শ্রেণির লোকদেরকে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা করা এবং তা নিয়ে গর্ব করা।
৫. ইয়াহুদিদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া।
৬. সময় নিকটবর্তী হওয়া,
৭. আমল কমে যাওয়া।
৮. ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া।

---

[৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৯২; মিশকাত, হা/১২৯।

৯. অধিক হত্যাকাণ্ড হওয়া।
১০. ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় হওয়া ইত্যাদি।

২. বড় আলামত : যা কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সংঘটিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। যেমন–

১. ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে।
২. দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।
৩. ঈসা (আঃ) আকাশ হতে ন্যায়বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন, তিনি খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন ও দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইসলামী শরীয়াহ অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন।
৪. ইয়াজুজ, মাজুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের দু'আ করবেন, অতঃপর তারা মারা যাবে।
৫. তিনটি বড় ভূমিকম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাজিরাতুল আরবে একটি।
৬. ধোঁয়া বের হবে, তা হলো আকাশ হতে প্রচন্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে ঢেকে নিবে।
৭. কুরআন জমিন হতে আকাশে তুলে নেয়া হবে।
৮. পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে।
৯. এক অদ্ভুত চতুষ্পদ জন্তু বের হবে।
১০. ইয়ামানের আদন নামক স্থান হতে ভয়ানক আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত।

এ দশটি নিদর্শন সংঘটিত হওয়ার পর পরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৩৮]

সিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত শুরু হবে :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ﴾

শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা যুমার- ৬৮)

তিনবার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁক হবে فَزَعٌ (ফাযা'উন) তথা ভীতি সৃষ্টিকারী। দ্বিতীয় ফুঁক صَعْقٌ (সা'আক) তথা সংজ্ঞা লোপকারী বিকট গর্জন। আর তৃতীয় ফুঁক হবে اَلْقِيَامُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আল কিয়ামু লি-রাব্বিল আলামীন) তথা বিশ্ববাসীর প্রতিপালকের সামনে হাযির হওয়ার ফুঁক। প্রথম ফুঁকটি সাধারণ বিভীষিকা সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মারা যাবে। তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাযির হবে।

---

[৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৭১২১; সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬৮; আবু দাউদ, হা/৪৩১৩; তিরমিযী, হা/২১৮৩।

সেদিন বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহর :

﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ﴾

যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন'আম- ৭৩)

মানুষকে আমলনামার দিকে ডাকা হবে :

﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتَابِهَا ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে। (বলা হবে) আজ তোমাদেরকে তারই বিনিময় দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (সূরা জাসিয়া- ২৮)

আমলনামা সবকিছু সঠিকভাবে তোলে ধরবে :

﴿هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

এই হলো আমার কিতাব, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে সঠিকভাবে। তোমরা যা করতে অবশ্যই আমি তা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম। (সূরা জাসিয়া- ২৯)

সঠিকভাবে আমলের ওজন হবে :

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ﴾

আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয়, তবুও তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া- ৪৭)

সেদিন আল্লাহ সকলের মধ্যে ফায়সালা করবেন :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾

তারা যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বিমত করত, অবশ্যই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। (সূরা জাসিয়া- ১৭)

শাফাআত :

যখন হাশরের ময়দানে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে পড়বে এবং সেখানে তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন তারা এ ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের রবের নিকট সুপারিশ করা হোক এর প্রচেষ্টা করবে। রাসূলদের মধ্য হতে যারা উলুল আযম (নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আঃ) তাঁরা অপারগতা স্বীকার করবেন। পরে এ বিষয়টি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট পৌছবে। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে সৃষ্টিজীবের সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেবেন। অতঃপর তিনি সুপারিশ করবেন, যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়। এ শাফাআত আল্লাহ তা'আলা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো কোন শাফাআত আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। (সূরা ত্বা-হা- ১০৯)
অর্থাৎ সুপারিশকারীকে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। যার জন্য সুপারিশ করা হবে সেও আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত হতে হবে। কোন মুশরিকের জন্য কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না।

পুলসিলাত :

সকলকেই পুলসিরাত পার হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। (সূরা মারইয়াম- ৭১, ৭২)
পুলসিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল বা পথ। মানুষ একে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে।
সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, অতঃপর তাঁর উম্মাত পুলসিরাত পাড়ি দেবেন। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন আর তাদের কথা হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। পুলসিরাতের দুধারে হুকের ন্যায় আংটা থাকবে। এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সৃষ্টিজীব হতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকে এর দ্বারা থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দেয়া হবে।[৩৯]
পুলসিরাত তরবারীর চেয়ে ধারালো, আর চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়।

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ ﷺ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চেয়ে ধারালো হবে।[৪০]
সবশেষে একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী কারা– এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমাদের বই "জান্নাতী ও জাহান্নামী কারা"।

---

[৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৮০৬; সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৭৩২৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৭১৭।
[৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৩।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান

আল্লাহ সব জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন :

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (তাকদীর অনুযায়ী)। (সূরা ক্বামার- ৪৯)

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরক্বান- ২)

عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত। এমনকি বোকা ও বুদ্ধিমত্তা অথবা অক্ষমতা ও পারদর্শীতা।[৪১]
অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَكِبَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا غُلَامُ إِنِّيْ مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوْكَ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوْكَ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে বসেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দেব। (কথাগুলো মনে রাখবে) তুমি আল্লাহর হেফাযত করো তাহলে আল্লাহ তোমার হেফাযত করবেন। যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন তুমি কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রেখো! গোটা জাতি যদি কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য একত্র হয়, তবে তারা সকলে মিলে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে গোটা জাতি যদি কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয়, তবে সকলে মিলে তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে রাখা হয়েছে এবং (তাকদীর লিখিত) কিতাব শুকিয়ে গেছে।[৪২]

---

[৪১] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৩৩৪০; সহীহ মুসলিম, হা/৬৯২২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬১৪৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৮৯৩।

[৪২] তিরমিযী, হা/২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৬৯; মিশকাত, হা/৫৩০২।

সৃষ্টিজগৎ তৈরির বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন– এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। তার কাছে সব কিছুই বর্তমান। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে নির্দেশ দিলেন, লিখ! কলম প্রশ্ন করল, কী লিখব? আল্লাহ বললেন, লিখ– "যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হবে।" এ থেকে বুঝা যায়, যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা সবকিছুই আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে। সৃষ্টির পূর্বে এবং আমল করার পূর্বেই আল্লাহ এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

যেন তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ জ্ঞান দিয়ে সবকিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা তালাক্ব- ১২)

আল্লাহর জ্ঞান সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ﴾

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হজ্জ- ৭০)

আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করেছেন সবকিছুই লাওহে মাহফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে যেভাবে অন্যান্য সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে সেভাবে তাকদীরের বিষয়টিও লিখা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

কিতাবে কোনকিছুই আমি বাদ দেইনি। (সূরা আন'আম- ৩৮)

তাকদীর চারভাবে নির্ধারিত হয় :

১. সকল সৃষ্টিজীবের তাকদীর। এটা আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২. সারা জীবনের তাকদীর। বান্দার মাঝে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দেয়ার সময় হতে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা।

৩. বাৎসরিক তাকদীর। এটা হলো, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা। এটা প্রত্যেক বৎসরের কদরের রাতে থাকে। যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حٰمٓ - وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ - اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ - اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ﴾

হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এ রাতে আমার আদেশক্রমে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা হয়। নিশ্চয় আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি। (সূরা দুখান, ১-৫)

৪. দৈনন্দিন তাকদীর। আর তা হলো সম্মান, অপমান (কিছু) দেয়া না দেয়া, জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করে, তিনি সর্বদা মহান কার্যে রত। (সূরা আর রহমান- ২৯)

মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন। কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন। কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন আবার কাউকে নিমজ্জিত করছেন। সকল সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন।

ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আমল বাদ দেয়া যাবে না :

ভাগ্যের ভাল-মন্দ আল্লাহর হাতে। তবে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চেষ্টা না করা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ অবশ্যই ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দিয়ে থাকেন। ভাগ্যে যা আছে চেষ্টার পর তা-ই হয়। অতএব উপযুক্ত চেষ্টার পর যা ফলে তাকে ভাগ্য মনে করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى﴾

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'বাকীউল গারকাদ' নামক জায়গায় এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর নিকট একটি ছড়ি ছিল। তিনি ছড়িটি দিয়ে মাটির উপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই অথবা এমন কোন প্রাণী নেই, যার জায়গা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

তাহলে আমরা কি আমাদের সে লিখিত ভাগ্যের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেব না? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না– তোমরা আমল করে যাও। কেননা সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয় আর দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি (তাঁর কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, "কাজেই যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে, তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে এবং ভালো কথাকে সত্য বলে আখ্যা দেয়, আল্লাহ তার জন্য সহজকে অর্থাৎ সৎকর্মকে সহজ করে দেন।" (সূরা লাইল : ৫-৭)[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। পৃথিবীতে কেউ যদি নেক আমল করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য করেন। আবার কেউ যদি গোমরাহ হতে চায় এবং অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় তাতেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বাধা প্রদান করেন না।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো আমল করতে থাকা, তাকদীর সম্পর্কে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না করা এবং এ আকীদা পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেন ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক করেন।

তাকদীরের ব্যাপারে আমাদের করণীয় :

১. কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য কেবল আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হওয়া। সৎকর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে এমনভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন সৎকর্ম সম্পাদন সহজ করে দেন এবং পাপকাজ হতে বিরত রাখেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শক্তিধর ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহর নিকট উত্তম ও অতীব পছন্দনীয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে, যাতে তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো। তুমি অক্ষম হয়ে যেও না এবং এমনটি বলো না যে, যদি আমি এমন এমন করতাম তবে এমন হতো না। বরং এ কথা বলো যে, আল্লাহ তা'আলা যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের কর্মের রাস্তা খুলে দেয়।[৪৪]

---

[৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৪৯; সহীহ মুসলিম, হা/৬৯০৩; মিশকাত, হা/৭৫।

[৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/ ৬৯৪৫; ইবনে মাজাহ, হা/৭৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৭২১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৭৯১; মিশকাত, হা/৫২৯৮।

২. আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণ করা এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া।

عَنْ اَبِىْ حَفْصَةَ ﷺ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهٖ : يَا بُنَيَّ اِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ حَتّٰى تَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ

আবু হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাঁর ছেলেকে বললেন, হে আমার পুত্র! ঈমানের প্রকৃত স্বাদ তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে না যতক্ষণ না এ বিষয়ে জ্ঞাত হবে, যে বিপদ তোমাকে আক্রমণ করেছে তা তোমাকে ছেড়ে যেত না। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমণ করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিল না।[৪৫]

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মুমিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহর কর্ম ও ফায়সালা সবকিছুই ভালো, ইনসাফভিত্তিক ও হিকমতপূর্ণ।

সুতরাং যে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনবে সে পেরেশানী হতে বেঁচে থাকবে। তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমনতা দূর হবে। হারিয়ে যাওয়া বা ছুটে যাওয়া বস্তুর উপর সে চিন্তিত হবে না। ভবিষ্যতকে ভয় পাবে না। সে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত ও রুজীও পরিমিত। কাপুরুষতা বয়স বাড়াতে পারে না। কার্পণ্যতা রুজী বাড়াতে পারে না। সে বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করবে, পাপ ও ত্রুটিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারণে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহ যা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এভাবে সে পবিত্র ও শান্তিময় জীবন লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (সূরা তাগাবুন- ১১)

اَلتَّوْحِيْدُ আত-তাওহীদ

اَلتَّوْحِيْدُ (আত তাওহীদ) শব্দটি وَحْدٌ মূলধাতু থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া। পরিভাষায় তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে সিফাতে কামাল বা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে একক বলে জানা এবং মানা। শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের গুণে তিনি যে একক– দৃঢ়তার সাথে এ ঘোষণা দেয়া এবং ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণ দেয়া।

---

[৪৫] আবু দাউদ, হা/৪৭০২।

তাওহীদ তিন প্রকার :

১। تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত) তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ :

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় নাম ও গুণাবলিতে তিনি একক এবং নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এ আকীদা পোষণ করাই হচ্ছে আল আসমা ওয়াস্‌সিফাতের তাওহীদ।

২. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ (তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ) তথা রুবূবিয়্যাতের তাওহীদ :

সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন একক রব বা প্রতিপালক। তিনি অফুরন্ত নিয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিকে প্রতিপালন করছেন। এ আকীদা পোষণের নামই হচ্ছে রুবূবিয়্যাতের তাওহীদ।

৩. تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ (তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ) তথা উলূহিয়্যাতের তাওহীদ :

এটা হলো যাবতীয় ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দেয়া। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদাতকে নিরংকুশ করা। শেষোক্ত তাওহীদ প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদের অনিবার্য ফলাফল। কেননা, আল্লাহর নাম ও মহত্ত্বের গুণে এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও মেহেরবানীর গুণে তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং মাবুদ হওয়ার যোগ্য। তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি এবং একক রুবূবিয়্যাতের দাবি হচ্ছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইলাহ হতে পারে না।

তাওহীদের মর্মকথা

তাওহীদের মূল বাণী হচ্ছে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তথা আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এ কালিমায় দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ لَا إِلٰهَ (লা-ইলাহ) যার অর্থ হলো, কোন ইলাহ নেই। আর দ্বিতীয় অংশ إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) যার অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহ ছাড়া। এর মর্মার্থ হলো :

১. 'লা-ইলাহা' অর্থ সকল গায়রুল্লাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আর 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

৩. 'লা-ইলাহা' মানে সকল বাতিল ইলাহকে বর্জন করা, আর 'ইল্লাল্লাহ' মানে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ করা।

অন্তরের সকল ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা মুছে ফেলে অন্তরটাকে খালি করে সেখানে কেবল তাওহীদের ধারণা ও বিশ্বাস স্থাপন করাই তওহীদের মূলকথা। একজন তাওহীদবাদী মুসলিম আল্লাহর সাথে অন্য কোন বস্তুকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তাওহীদের এ কালিমাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া :

১. আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
৩. একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করা।
৪. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই গায়েব তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা।
৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতির মালিক মনে না করা।
৬. আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা।
৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রব, আইনদাতা বা বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা।
৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস বা বান্দা হয়ে না থাকা।
৯. জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
১১ . আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর না করা।
১২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশা পোষণ না করা।
১৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা।
১৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বেশি প্রিয় না জানা।
১৫. কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
১৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী হিসেবে মনে না করা।
১৭. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়াত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
১৮. নবী-রাসূল, জিন-ফেরেশতা, ওলী-আওলিয়া, পীর-বুযুর্গ ও সাধু-স্বজনকে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা।
১৯. কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক হিসেবে বিশ্বাস না করা।

মোটকথা, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন–সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর বিধিবিধান মেনে নেয়াই হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর মর্মকথা।

তাওহীদের শর্তাবলি

তাওহীদ তথা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর কতগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এ শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোন শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তিই পাওয়া যাবে না। যেমন সালাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে যদি কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। তাওহীদের কয়েকটি শর্ত নিচে আলোচনা করা হলো :

১. اَلْعِلْمُ (জ্ঞান)

তাওহীদের প্রথম শর্ত হলো তাওহীদের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জ্ঞান অর্জন করা। 'লা-ইলাহা' বলে কাকে বর্জন করতে হবে? কীভাবে বর্জন করতে হবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলে কাকে গ্রহণ করতে হবে? কীভাবে গ্রহণ করতে হবে? এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

(হে নবী!) জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্যিকার) মাবুদ নেই। অতএব তুমি নিজের এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের গোনাহের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতার খবর রাখেন এবং (শেষ) ঠিকানা সম্পর্কেও জানেন। (সূরা মুহাম্মাদ- ১৯)

আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদাতের হকদার– এ কথা না জানা বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই তাওহীদের ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা বান্দার ইসলাম কবুলের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

এটা মানুষের জন্য উপদেশবাণী। যাতে তারা এর দ্বারা সতর্ক করে এবং জেনে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ একজনই। আর জ্ঞানীরা যেন এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা ইবরাহীম- ৫২)

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (যাতে তারা জেনে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ একজনই)।

এখানে জানার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, মানুষের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর জ্ঞানার্জন করা। আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর জ্ঞান না থাকা।

যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্য দিল আবার গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর ইবাদাতও করল, তার এ সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই, যদিও সে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং ইসলামের কিছু কাজকর্ম করে।

২. اَلصِّدْقُ (সত্যতা)

একজন মুমিনকে তাওহীদের কালিমায় সত্যবাদী হতে হবে। সে মুখে কালিমা উচ্চারণ করার পর যদি অন্তরে তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে তবে সে মুমিন হতে পারবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ ۘ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ﴾

যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসত তখন তারা বলত, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল আর আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, আপনি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন- ১)

এখানে মুনাফিকরা নবী ﷺ কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কথাটাকে তাকিদ দিয়ে বলেছে "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি"। আর সাক্ষ্য বলা হয় আন্তরিক বিশ্বাসসহ কোন কথা বলাকে। যেহেতু তারা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কথাটি বলেনি, এ কারণে 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি' তাদের এ কথাটি বলা মিথ্যা হয়েছে। অতএব বর্তমানেও কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে এর সত্যতা প্রমাণ করে না, তাহলে সে ব্যক্তিও মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾

মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ এবং বিচার দিনের উপর ঈমান এনেছি; অথচ তারা ঈমানদার নয়। (সূরা বাক্বারা- ৮)

কালিমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোন ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ﴾

তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্যবাদী। (সূরা হুজুরাত- ১৫)

৩. اَلْاِخْلَاصُ (একনিষ্ঠতা)

কালিমার দাবি অনুযায়ী বান্দার সকল ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করাই হচ্ছে ইখলাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম। (সূরা বায়্যিনাহ- ৫)

﴿اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ﴾

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব তুমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করো। (সূরা যুমার- ২)

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾

জেনে রেখো, একনিষ্ঠ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই জন্য। (সূরা যুমার- ৩)

﴿فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে তাঁর ইবাদাতে একনিষ্ঠ হয়ে ডাকো। (সূরা মু'মিন- ১৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কালিমায় বিশ্বাসী হওয়ার পর পূর্ণ ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে।

৪. اَلْقَبُوْلُ (গ্রহণ করা)

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– এ কালিমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ জানল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করল, কিন্তু গ্রহণ করল না, তাহলে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মক্কার কাফির-মুশরিকরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ ভালো করেই জানত। আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করত; কিন্তু অহংকারবশত গ্রহণ করত না। ফলে তারা কাফির-মুশরিকই রয়ে গেল। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ - وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْۤا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ﴾

যখন তাদেরকে বলা হতো, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা সাফফাত- ৩৫, ৩৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' তথা আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তখন তারা বলত, আমরা কি

এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দেব। অথচ তাদেরকে দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতীমা ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়নি। কিন্তু তারা 'লা ইলাহা' থেকে ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে, এর মাধ্যমে আমাদের সকল দেব-দেবীকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

৫. اَلْاِنْقِيَادُ (সমর্পণ করা)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং বাস্তবে ইবাদাতের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার পর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। এ সমর্পণ হবে সকল প্রকার তাগুতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে। আর এর বাস্তব পরীক্ষা হবে তখন, যখন কুরআন-সুন্নাহর কোন বিষয় তার পার্থিব স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। সে মুহূর্তে যদি নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে মুমিন। আর যদি পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করে তাহলে সে মুমিন নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা- ৬৫)

এ নির্দেশটি কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর হবে। নবী ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যে পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালাকারী সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি মানা ও না মানার উপরই কোন ব্যক্তির মুমিন হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। যে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া এবং এতে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ না করা ঈমানের পরিচয়। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর ফায়সালার উপর আত্মসমর্পন করবে না সে মুমিন হতে পারবে না।

এ সকল শর্তের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফরি ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

তাওহীদের রুকন

রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন জিনিস শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না। অনুরূপ তাওহীদের রুকন বাস্তবায়ন করা ছাড়া ঈমান সঠিক হয় না। তাওহীদের রুকন দুটি :

প্রথম রুকন হচ্ছে, كُفْرٌ بِالطَّاغُوْتِ তথা তাগুতকে অস্বীকার করা। আর দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে, اِيْمَانٌ بِاللهِ তথা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত রশি ধারণ করল যা কখনো ছিড়বে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাক্বারা- ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ (তাগুতকে অস্বীকার করে) এটা হলো প্রথম রুকন এবং وَيُؤْمِنْ بِاللهِ (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে) এটা হলো দ্বিতীয় রুকন।

যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা ঈমানের একটি রুকন, তাই এর পরিচয় বা সংজ্ঞা জানা একান্ত জরুরি। কারণ অধিকাংশ মানুষই তাগুত সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। আর যে ব্যক্তি তাগুত সম্পর্কে জানে না এবং তাগুতকে চিনে না তার পক্ষে তাগুত থেকে দূরে থাকা এবং তাকে বর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই নিচে তাগুতের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

তাগুতের পরিচয়

طَاغُوْتٌ (তাগুত) শব্দের আভিধানিক অর্থ :

اَلطَّاغُوْتُ (আত তাগুত) শব্দটি طُغْيَانٌ (তুগইয়ান) শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে, সীমালঙ্ঘনকারী, বিপথে পরিচালনাকারী ইত্যাদি।তাগুত একবচন হতে পারে আবার বহুবচনও হতে পারে, পুরুষও হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে।

طُغْيَانٌ (তুগইয়ান) শব্দের অর্থ বন্যাও হয়। নদীর পানি যখন তার তীরের সীমানা অতিক্রম করে উপরে উঠে যায় তখনই তাকে আমরা বন্যা বলি। তদ্রুপ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁরই আইন মেনে চলবে– এটিই আল্লাহর বিধান। কিন্তু ঐ মানুষ যখন আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে সরে পড়ে এবং অন্য পথকে বিশ্বাস করে ও অনুসরণ করে তখনই সে সীমালঙ্ঘন করে।

طَاغُوْتٌ (তাগুত) এর পারিভাষিক অর্থ :

আবু ইসহাক বলেন,

كُلُّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ جِبْتٌ وَطَاغُوْتٌ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যসব মাবুদকেই جِبْتٌ (জিবত) এবং طَاغُوْتٌ (তাগুত) বলা হয়।[৪৬]

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয় তারাই তাগুত। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কাছে বিচারাচার নিয়ে যাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের নামে মান্নত করা হয়, পশু জবাই করা হয় এবং যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা সাব্যস্ত করা হয় তারাও তাগুত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,

اَلطَّاغُوْتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهٗ مِنْ مَعْبُوْدٍ اَوْ مَتْبُوْعٍ اَوْ مُطَاعٍ . فَطَاغُوْتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُوْنَ اِلَيْهِ غَيْرَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اَوْ يَعْبُدُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْ يَتْبَعُوْنَهٗ عَلٰى غَيْرِ بَصِيْرَةٍ مِنَ اللهِ اَوْ يُطِيْعُوْنَهٗ فِيْمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ طَاعَةٌ لِلّٰهِ فَهٰذِهٖ طَوَاغِيْتُ الْعَالَمِ اِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ اَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ اَكْثَرَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ اِلٰى عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ وَعَنِ التَّحَاكُمِ اِلَى اللهِ وَاِلَى الرَّسُوْلِ اِلَى التَّحَاكُمِ اِلَى الطَّاغُوْتِ وَعَنْ طَاعَتِهٖ وَمُتَابَعَةِ رَسُوْلِهٖ اِلَى الطَّاغُوْتِ وَمُتَابَعَتِهٖ

তাগুত হচ্ছে ঐ সকল উপাস্য, নেতা-নেত্রী, মরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হয়। এরাই হলো পৃথিবীর বড় বড় তাগুত। তুমি যদি এই তাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে অধিকাংশ মানুষকেই দেখতে পাবে যে, তারা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে তাগুতের ইবাদাত করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে (কুরআন ও সুন্নাহর কাছে) বিচার-ফায়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য করে। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাগুতের নির্দেশ পালন করে।[৪৭]

---

[৪৬] তাহযীবুল লুহাত, আল আযহারী, মাকতাবাতুশ শামেলা, পৃ:৯২।

[৪৭] এ'লামুল মুওয়াক্কেঈন : ১/৫০।

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফক্বী (রহ.) বলেন,

اَلَّذِيْ يَسْتَخْلِصُ مِنْ كَلَامِ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : اَنَّ الطَّاغُوْتَ كُلُّ مَا صَرَفَ الْعَبْدَ وَصَدَّهُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَاِخْلَاصِ الدِّيْنِ وَالطَّاعَةِ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ. سَوَاءٌ فِيْ ذٰلِكَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيْطَانُ مِنَ الْاِنْسِ، وَالْاَشْجَارُ وَالْاَحْجَارُ وَغَيْرُهَا. وَيَدْخُلُ فِيْ ذٰلِكَ بِلَا شَكٍّ: اَلْحُكْمُ بِالْقَوَانِيْنِ الْاَجْنَبِيَّةِ عَنِ الْاِسْلَامِ وَشَرَائِعِهٖ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا وَضَعَهُ الْاِنْسَانُ لِيَحْكُمَ بِهٖ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوْجِ وَالْاَمْوَالِ. وَلِيُبْطِلَ بِهَا شَرَائِعَ اللهِ. مِنْ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَتَحْرِيْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ. مِمَّا اَخَذَتْ هٰذِهِ الْقَوَانِيْنَ تَحْلِلُهَا وَتَحْمِيْهَا بِنُفُوْذِهَا وَمُنَفِّذِيْهَا. وَالْقَوَانِيْنَ نَفْسُهَا طَوَاغِيْتٌ، وَوَاضِعُوْهَا وَمُرَوِّجُوْهَا طَوَاغِيْتٌ. وَاَمْثَالُهَا مِنْ كُلِّ كِتَابٍ وَضَعَهُ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ لِيَصْرِفَ عَنِ الْحَقِّ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِمَّا قَصْدًا اَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مَنْ وَاضَعَهُ. فَهُوَ طَاغُوْتٍ

তাগুত সম্পর্কে সালাফদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে যা জানা যায় তার সারমর্ম হলো : আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও ইবাদাত এবং আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার পরিবর্তে যাদের আনুগত্য ও ইবাদাত করা হয় অথবা আল্লাহর ইবাদাতের সঙ্গে যাদেরকে মাধ্যম হিসেবে অথবা আল্লাহর অংশীদার হিসেবে আনুগত্য করা হয় তারা সকলেই তাগুত। এ তাগুত জিন শয়তান, মানুষ শয়তান, গাছ, পাথর ইত্যাদি সবই হতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহর আইন বাতিল করে মানবরচিত সকল আইন-কানুন অবশ্যই এই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর হুদুদ, হাদ্দুল ক্বিসাস (খুনের বদলে খুন), হাদ্দুস সারিক্বা (চোরের হাত কাটার বিধান), হাদ্দুয যিনা (যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি)। এমনিভাবে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করা। যেমন, সুদকে হালাল করে দেয়া, যিনা-ব্যভিচারকে হালাল করে দেয়া। মানবরচিত সকল আইন-কানুন যেমন তাগুত তেমনিভাবে যারা এগুলো তৈরি করেছে, যারা এ সকল মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে সেসব বিচারক এবং যারা মানবরচিত আইনের বিচার-ফায়সালাকে বাস্তবায়ন করে সে সকল বাহিনী এবং যারা এই মানবরচিত সংবিধান পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত তারাও তাগুত। এমনিভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে যে সকল আইনের বই রচনা করা হয়েছে সে বইগুলো এবং যারা এগুলো রচনা করেছে চাই তারা জেনে-বুঝে রচনা করুক বা না বুঝে করুক তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন তা হতে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখার কারণে অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার কারণে তাগুত বলে বিবেচিত।[৪৮]

---

[৪৮] হাশিয়া ফতহুল মুজিদ, পৃ: ২৮২।

এতক্ষণ পর্যন্ত তাগুতের যেসকল সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার সারমর্ম হলো, তাগুত বলা হয় আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় এবং সে এটা পছন্দ করে। চাই সেটা ইবাদাতের কোন অংশবিশেষ হোক অথবা ইবাদাতের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে হোক। তাই নিম্ন বর্ণিত সকলেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত :

- আল্লাহর ভালোবাসার মতো বা তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবেসে যার আনুগত্য করা হয় সে তাগুত।
- আল্লাহর আনুগত্য ও বিচার-ফায়সালা মেনে নেয়ার পরিবর্তে যাদের বিচার-ফায়সালা মেনে নেয়া হয় তারা তাগুত।
- আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর নামে মান্নত করা, কুরবানী করা ও পশু জবাই করা ইত্যাদির পরিবর্তে যাদের নামে এগুলো করা হয় তারা তাগুত।
- আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির ক্ষেত্রে যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্বীকার করা হয়, অথবা আল্লাহর ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির আংশিক অধিকারী স্বীকার করা হয় তারা তাগুত।
- মানবরচিত সংবিধান, আইন-কানুন ও মানবরচিত ইবাদাতের পদ্ধতিও তাগুত।
- সকল প্রকার ফিতনা-ফাসাদ, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার নেতৃত্ব দানকারী নেতা-নেত্রী তাগুত।
- শিরক-বিদ'আত ও কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বিভিন্ন রসম-রেওয়াজের উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষকরাও তাগুত।

প্রধান প্রধান তাগুত

তাগুত অনেক প্রকারের হতে পারে, যা আমরা তাগুতের সংজ্ঞা থেকে জানতে পেরেছি। তবে কিছু তাগুত রয়েছে, যারা এদের মধ্যে প্রধান। নিম্নে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. **শয়তান** : গায়রুল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান। চাই সে জিনের মধ্য হতে হোক অথবা মানুষের মধ্য হতে হোক।

২. **শাসক** : ঐ সকল শাসক, যারা নিজেরা সার্বভৌমত্বের দাবি করে এবং আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরি করে।

৩. **বিচারক** : ঐ সকল বিচারক, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে।

৪. **পীর-ফকির** : আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মাধ্যম ও অংশীদার হিসেবে ইবাদাত গ্রহণকারী পীর-ফকির, কবর-মাজার ও দরগা ইত্যাদি।

৫. গণক, জ্যোতিষী, জাদুকর : যারা ইলমুল গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করে।
৬. আল-হাওয়া : আল্লাহর হুকুম পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী আল-হাওয়া বা নাফস (প্রবৃত্তি)।
৭. তাক্বলিদে-আবা : কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে যে সকল বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদাত করা হয় সে সকল পূর্বপুরুষরাও তাগুত। যদি তারা এটা সমর্থন করে থাকেন।
উপরোক্ত প্রধান সাত প্রকার তাগুতের বিস্তারিত বিবরণ নিচে আলোচনা করা হলো :

১. শয়তান

শয়তান দুপ্রকার : (ক) মানুষ শয়তান ও (খ) জিন শয়তান। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

(হে নবী) বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশার কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (একমাত্র) মাবুদের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে। (সূরা নাস)
এ সূরার শেষ আয়াতে খান্নাসকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। জিন খান্নাস ও মানুষ খান্নাস। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ শয়তানগুলো জিন শয়তানদের চেয়ে বেশি ভয়ংকর হয়ে থাকে। এরাও শয়তানের মতো মিথ্যাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে উপস্থাপন করে। কাফির ও মুশরিকদের নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾

আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (সূরা বাকারা- ১৪)
আলোচ্য আয়াতে شَيْطَانٌ (শাইত্বান) শব্দটিকে বহুবচনে شَيَاطِيْنٌ (শায়াত্বীন) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে شَيَاطِيْنٌ (শায়াত্বীন) বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

জিন শয়তান :

জিন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে অথবা অন্যের ইবাদাত করতে প্রেরণা জোগায়; বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদাত নেয় তারা তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। জিন শয়তানরা গণকদেরকে গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে, যার কারণে মানুষ গণকদের কাছে গায়েব জানার জন্য যায়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

মানুষ শয়তান :

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানায় অথবা অন্যের ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ যোগায় তারা এ শ্রেণির তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এরা হচ্ছে–

সেসব পীর এবং মাজারের খাদেম, যারা মানুষকে পীর ও মাজারে সিজদা দিতে এবং সেখানে মান্নত করতে আহ্বান জানায়।

কুফর এবং শিরকের ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য করাই হচ্ছে তার ইবাদাত করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি (এ বলে যে) তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াসীন- ৬০)

এ আয়াতে শয়তানের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। শয়তান যে জিনিসের দিকে আহ্বান করে সেই জিনিসে লিপ্ত হওয়াই শয়তানের ইবাদাত ও আনুগত্যে লিপ্ত হওয়ার শামিল। শয়তানের পরিচয় ও তার কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমাদের বই "শয়তান থেকে বাঁচার কৌশল"।

২. শাসক

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলাম হিসেবে। মনিব বা মালিক হিসেবে নয়। মানুষ হলো গোলাম আর আল্লাহ হলেন মনিব। এই মানুষ যখন নিজের মূল পরিচয় ভুলে গিয়ে দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে মনিবের আসন দখল করে বসে তখনই সে তাগুত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জাতীয় তাগুত হওয়ার জন্য সর্বময় ক্ষমতার মালিক দাবি করা জরুরি নয়। বরং বিশেষ কোন এলাকা বা ভূখণ্ডের ক্ষমতার মালিক ও বিধানদাতা দাবি করলেই সে ঐ অঞ্চলের ইলাহ বা রব হয়ে যায়। যুগে যুগে ফিরাউনরা এ জাতীয় ইলাহ ও রব হওয়ার দাবি করেছিল। কুরআনে ফিরাউন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ﴾

ফিরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমি তো জানি না। (সূরা ক্বাসাস- ৩৮)

এ আয়াতে সে নিজেকে স্পষ্টভাবে ইলাহ বলে দাবি করেছে। ফিরাউন মূলত নিজেকে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং ইলাহ দাবি করেছিল। আর যেহেতু যিনি ক্ষমতার মালিক, তিনি আইন প্রনয়ণেরও অধিকারী। সে অর্থে সে নিজেকে রব বলে ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ মিশর ভূখণ্ডে কেবলমাত্র তার ক্ষমতা ও রাজত্ব চলবে। সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার হুকুম কার্যকর হবে। অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾

ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ঘোষণা করল যে, হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের বাদশাহী কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি তা দেখ না? (সূরা যুখরুফ- ৫১)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ফিরাউন নিজেকে যে ইলাহ ও রব বলে দাবি করেছিল সেটা শুধুমাত্র মিশরের। বর্তমানে যে সকল শাসকবর্গ নিজেদের কোন দেশ অথবা এলাকার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে দাবি করে এবং তারা তাদের অধীনস্ত জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে– তারা সকলেই তাগুত। তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ইলাহ ও রবে পরিণত হয়। পবিত্র কুরআনে কোন মানুষকে রব ও ইলাহ বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَاۤ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾

বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি কালিমার দিকে এসো, যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান। আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করব না এবং তার সাথে কোনকিছুকে শরীক স্থাপন করব না; আর আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম। (সূরা আলে ইমরান- ৬৪)

﴿اِتَّخَذُوْاۤ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের আলিম ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও। (সূরা তাওবা- ৩১)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের পণ্ডিত তথা নেতানেত্রীদেরকে এবং সংসারবিরাগী তথা পীর-বুযুর্গদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছিল। কীভাবে বানালো তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসটিতে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ : ﴿اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ . قَالَ : اَجَلْ وَلٰكِنْ يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهٗ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا اَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهٗ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ

আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম। তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিল। (তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার গর্দান থেকে এই মূর্তিটি ফেলে দাও।) ঐ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরআনের এ বাণী পাঠ করতে শুনলাম– "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" আদী ইবনে হাতেম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা (ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা) তো তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের ইবাদাত করে না। তাহলে তাদেরকে রব বানাল কী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে রব বানিয়েছে। কেননা তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত কোন কিছুকে হালাল করে দেয় তখন লোকেরা সেটাকে হালাল হিসেবে মেনে নেয়। আবার তারা যদি আল্লাহর হালালকৃত কোন কিছুকে হারাম করে দেয় তখন তারা ওটাকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে তারা আল্লাহর বিধানের কোন তোয়াক্কা করে না। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত বা আনুগত্য।[৪৯]

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আলুসী (রহ.) বলেন,

قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِيْنَ : لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَرْبَابِ أَنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا اِلٰهِيَّتَهُمْ . بَلِ الْمُرَادُ : أَنَّهُمْ أَطَاعُوْهُمْ فِيْ أَوَامِرِهِمْ وَنَوَاهِيْهِمْ

অর্থাৎ অধিকাংশ মুফাসসীরদের বক্তব্য হলো, এখানে اَلْأَرْبَابِ দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা (ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা) তাদেরকে (নেতা এবং পীর-বুযুর্গদেরকে) গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করত। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করত।[৫০]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে যে সকল শাসকবর্গ আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল করে দিয়েছে অথবা আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম করে তারা ফিরাউনের মতো নিজেরাই রব তথা আল্লাহর আসনে বসে আছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এ ঘোষণার প্রধান বাধা ছিল সমকালীন শাসকবর্গ। মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে ফিরাউন বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইবরাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধে নমরূদ, মুহাম্মাদ ﷺ এর বিরুদ্ধে আবু জাহেল ও আবু লাহাব। এরা সকলেই ছিল শাসক। 'লা-ইলাহা' বলে সর্বপ্রথম এই শাসক নামের তাগুতকে বর্জন করতে হবে। কেননা অন্যান্য তাগুতগুলো এদের ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয়। এরা সকল প্রকার শিরকের হয়তো উদ্ভাবক, নয়তো সংরক্ষক নতুবা পৃষ্ঠপোষক।

---

[৪৯] বায়হাকী, হা/২০৮৪৭; তিরমিযী, হা/৩০৯৫।

[৫০] যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব (রহ.) ৪র্থ খণ্ড, ২০ পৃ:।

সর্ব যুগে দুশ্রেণির লোকেরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।
১. মানবরচিত আইনে পরিচালিত দেশের শাসক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।
২. ওলামায়ে 'ছু' (নিকৃষ্ট দুনিয়াদার আলেম)।
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন,

وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ • وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

যুগে যুগে দুশ্রেণির লোক ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছে। এক শ্রেণি হলো শাসকগোষ্ঠী, আর অপর শ্রেণি হলো ধর্মীয় আলেম ও সংসারবিরাগী পীর-পুরোহিত।[৫১]

সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ নয় বরং আল্লাহ :

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন : "চূড়ান্ত, চরম, অসীম, অবাধ, অবিভাজ্য, হস্তান্তর যোগ্যহীন, শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান– এরূপ ক্ষমতা।"
তাগুতী রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তারা ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচন করে। এভাবে ভোটের মাধ্যমে গোটা দেশের জনগণের ক্ষমতা নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর সংসদ সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়। এভাবেই সংসদ গোটা দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা, জনগণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হাতে সার্বভৌমত্ব; তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা মুলক- ১)
এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বড়ই পবিত্র ও বরকতময়। কারণ তাঁর সত্তা সকল প্রকার শিরকের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই, ফলে তাঁর সার্বভৌমত্বে স্থলাভিষিক্ত কেউ নেই। সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনি বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও তাদের ক্ষমতা নির্ধারণকারী। এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক। তিনি স্রষ্টা, বাকি সকলেই সৃষ্টি। সৃষ্টিকুলের সকল কিছুই স্রষ্টার অধীনে। আর যারা কারো অধীনে থাকে তারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। তাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই মেনে নিতে হবে।

---

[৫১] কিতাবুল জিহাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ।

সংবিধান হিসেবে কুরআন-সুন্নাহকে মানতে হবে :
তাগুতী রাষ্ট্রের একটি মৌলিক উপাদান হলো- তাদের নিজেদের বানানো সংবিধান। এ সংবিধান তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিষয়ে যদি আল্লাহর কালামের সাথে সংবিধানের সংঘর্ষ হয় সেক্ষেত্রে সংবিধান বহাল থাকবে। আল্লাহর কালামকে হয়তো অপব্যাখ্যা করবে নয়তো প্রয়োজনে বাতিল করবে। কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তারা সংবিধানের দিকে ফিরে যায়। অতঃপর সংবিধান থেকে প্রমাণ করতে পারলে সকলেই তা মেনে নেয়।
একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহই হলো আইনের উৎস। অন্য কোন আইন যদি এর সাথে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। সকল বিতর্কের সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

অতঃপর তোমাদের মাঝে যদি কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে বিষয়টি ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে থাক; এটাই উত্তম এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। (সূরা নিসা- ৫৯)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি জিনিসকে শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস)।[৫২]
আল্লাহর বিধানকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ উল্টে দেয়ার কেউ নেই। আর তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর। (সূরা রা'দ- ৪১)
যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারক, সেহেতু আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান তালাশ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

বলো, তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব– যদিও তিনি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? (সরা আন'আম- ১১৪)

[৫২] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/ ৩৩৩৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৩১৯।

আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে সে মুমিন হতে পারে না। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা- ৬৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে সপে না দেয় তাহলে সে মুমিন হতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে কাউকে স্বাধীনতা না দিয়ে সকলকে এক বাক্যে তা মেনে নিতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾

কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। (সূরা আহযাব- ৩৬)

এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কোন সংবিধান রচনা করা আবার সে সংবিধান মানতে বাধ্য করা আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহ করার শামিল।

সার্বভৌমত্বের আদেশই হচ্ছে আইন। সুতরাং যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই আইন প্রণয়নের মালিক, অন্য কেউ নয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

জেনে রেখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই; যিনি মহিমাময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ। (সূরা আ'রাফ- ৫৪)

যখন কোন ব্যক্তি এ কথা মেনে নেয় যে, একমাত্র আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা, তখন অনিবার্যভাবে তাকে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, ইলাহ ও রবও একমাত্র আল্লাহই। ইবাদাত ও আনুগত্যের হকদারও একমাত্র তিনিই। নিজের সৃষ্টির জন্য আইন প্রণেতা ও শাসক তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

একজন হবেন স্রষ্টা, অন্যজন হবে মাবুদ, তৃতীয়জন হবে সংকট নিরসনকারী, চতুর্থজন ক্ষমতাসীন ও আনুগত্যের অধিকারী– এটা হতে পারে না। হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার অধিকারও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। কেননা সকল প্রকার আইন প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। সুতরাং অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার সাহস দেখাবে, সে-ই সীমালঙ্ঘন করবে।

আইন তৈরি করার জন্য যে সকল গুণাবলির প্রয়োজন সেসকল গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য কোন মানুষের ভেতর পাওয়া সম্ভব নয়। মানবজাতির জন্য আইন তৈরি করা ও সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এই ক্ষমতা ও অধিকার নেই। সুতরাং কেউ যদি মানুষের জন্য আইন তৈরি করে এবং নিজেকে আইন প্রণেতা বা সংবিধান রচয়িতা দাবি করে সে যেন নিজেকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর অংশীদার বলে দাবি করল। অথচ আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা শুরা- ২১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের তৈরি করা বিধানকে শরীয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা شَرِيعَةٌ (শারী'আত) অর্থ হচ্ছে, اَلطَّرِيقَةُ الْمُتَّبَعَةُ حَقًّا كَانَتْ أَوْ بَاطِلًا অর্থাৎ 'অনুসৃত পথ' চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। এতে বুঝা যায় যে, কাফির-মুশরিকদের তৈরি করা বিধান স্বতন্ত্র একটি শরীয়াত, যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আরেকটি আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য। (সূরা কাফিরূন- ৬)

এ আয়াতে দেখা গেল যে, ইসলাম যেরকম একটি স্বতন্ত্র দ্বীন সেরকমভাবে কাফির-মুশরিকদের মতবাদও একটি দ্বীন। আর দ্বীনে ইসলামের সাথে দ্বীনে কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে হয়তো দ্বীনে ইসলাম থাকবে, নয়তো দ্বীনে কুফর থাকবে। যুগে যুগে ফিরাউনরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের দ্বীনে কুফরকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾

ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালককে ডাকুক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (সূরা মু'মিন- ২৬)

এ আয়াতে দেখা গেল যে, ফিরাউন তার দ্বীন রক্ষার জন্য উত্তেজিত হয়ে মূসা (আঃ) কে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হলো, যাতে মূসা (আঃ) তার দ্বীনকে পাল্টে দিতে না পারেন।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবনব্যবস্থা তালাশ করবে, তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না। অতঃপর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান- ৮৫)

আল্লাহ তা'আলার দেয়া দ্বীন ও শরীয়াত মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। আর মানবরচিত দ্বীন ও শরীয়াত ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলার দেয়া দ্বীন ও শরীয়াতের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, যা ওহীর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণের প্রতি নাযিল করা হয়। পক্ষান্তরে মানবরচিত দ্বীন ও শরীয়াতের উৎস মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা, যা বিতাড়িত শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মাথায় প্রবেশ করানো হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল, তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম- ১২১)

তাই প্রতিটি মানুষ হয়তো দ্বীনে হকের পক্ষে, নয়তো দ্বীনে বাতিলের পক্ষে। হয়তো আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধানের পক্ষে, নয়তো মানবরচিত তাগুতী সংবিধানের পক্ষে। এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং যারা আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধানের পক্ষে তারা আল্লাহর অনুসারী আর যারা মানবরচিত সংবিধানের পক্ষে তারা হয়ত তাগুত; নতুবা তাগুতের অনুসারী।

৩. বিচারক

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং ইসলামের পরিভাষায় যাদেরকে তাগুত বলা হয় তাদের একটি মারাত্মক তাগুত হলো আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালাকারী বিচারক। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, আবার তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা- ৬০)

এখানে 'তাগুত' বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে। মূলত যে বিচারব্যবস্থা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না মূলত সেটাই তাগুত। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের উপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী এ ধরণের আদালতকে অস্বীকার করাই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে তাগুতকে অস্বীকার না করলে ঈমানদার হওয়া যায় না। আর আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করা হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

একদা জনৈক ইয়াহুদির সাথে জনৈক মুনাফিকের ঝগড়া হলে, ইয়াহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিচারক মানল। সে জানত, ধর্ম বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর মুনাফিকের দাবি ছিল মিথ্যা, সে মনে করল, আমি বাইরে মুসলিম হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট চালাকীতে কাজ হবে না। তাই একজন অসৎ ইয়াহুদি সরদার কা'ব ইবনে আশরাফকে বিচারক মানতে চাইল। অবশেষে উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলো এবং ইয়াহুদির জয় হলো। কিন্তু মুনাফিকটি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ওমর (রাঃ) এর নিকট গেল। সে ধারণা করেছিল ওমর (রাঃ) তার পক্ষেই রায় দেবেন। এদিকে ইয়াহুদিও মনে করল যে, ওমর (রাঃ) ন্যায়পরায়ণ; তিনি তার পক্ষেই রায় দেবেন। কাজেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়ে ওমর (রাঃ) কাছে গেল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং এও বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মীমাংসা করেছিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি মানেনি। ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দ্বারা মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ করে দিলেন এবং বললেন,

"নবীর মীমাংসা অমান্য করার এটাই শাস্তি।" অতঃপর মুনাফিকটির ওয়ারীসরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, একটা আপোষ মীমাংসার জন্যই ওমরের নিকট যাওয়া হয়েছিল, অনর্থক তিনি তাকে হত্যা করেছেন। কাজেই আমরা হত্যার প্রতিশোধ চাই। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার না করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾

আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন যারা সে অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়েদা- ৪৪)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন যারা সে অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করে না তারা যালিম (অন্যায়কারী)। (সূরা মায়েদা- ৪৫)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়াসালা করে না তারা ফাসিক। (সূরা মায়েদা- ৪৭)

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, আল্লাহ তাদের পরিণাম সম্পর্কে তিনটি বিধান বর্ণনা করেছেন। (এক) তারা কাফির। (দুই) তারা যালিম। (তিন) তারা ফাসিক।

প্রথমত ঃ তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী।

দ্বিতীয়ত ঃ তার এ কাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতির বিরোধী। কারণ আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করল তখন সে মূলত যুলুম করল।

তৃতীয়ত ঃ বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করল, তখনই সে দাসত্ব ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে চলে গেল। আর এটিই হলো অবাধ্যতা বা ফাসিকী। সুতরাং যেখানেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করে বিচার করা হবে, সেখানেই এ তিনটি অপরাধ থাকবে।

আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালাকারী যদি মনে করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান মানুষের জন্য যথেষ্ট নয় এবং তা মানুষের জন্য কল্যাণকরও নয়। অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান এক সময় কল্যাণকর ছিল। বর্তমান আধুনিক যুগের জন্য তা উপযোগী নয়। অতঃপর তারা মানবরচিত বিধানে বিচার-ফায়সালা করে তবে তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

আরেক প্রকার বিচারক রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান-ই হলো একমাত্র সঠিক ও কল্যাণকর বিধান এবং বর্তমান যুগেও এটি উপযোগী। তবে চাকরি ঠিক রাখার জন্য বাধ্য হয়ে মানবরচিত বিধানে

বিচার-ফায়সালা করে। এরা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদাতসমূহও পালন করে। এ জাতীয় বিচারকদের ব্যাপারেও উলামায়ে কেরামদের একদল একই মতামত পোষণ করেছেন। কেননা তাদেরকে এই মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করতে কেউ বাধ্য করেনি। তারা যদি সত্যিকারেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখত তাহলে তারা কোন অবস্থাতেই মানবরচিত বিধানে বিচার-ফায়সালা করত না। কেননা কোন মুমিন নারী-পুরুষ আল্লাহর বিচার-ফায়সালা বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন প্রকার নিজস্ব মতামত বা বিবেচনা করার অধিকার রাখে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا﴾

কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হলো। (সূরা আহযাব- ৩৬)

এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের ব্যাপারে অন্য কিছু করার অধিকার থাকে না। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অন্য কিছু ইখতিয়ার করা তো দূরের কথা আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান মেনে নেয়া সত্ত্বেও যদি তার মনের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে তবে সে মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা- ৬৫)

৪. পীর-ফকীর

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত ও আনুগত্য করা হয় এবং যাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় তাগুত বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের আরেকটি প্রকার হলো পীর-ফকীর ও দরগাহ-মাজার। অন্যান্য তাগুতগুলো মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে নিজেদের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করলেও তা ধর্মের নামে করে না। কিন্তু এ প্রকার তাগুত মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের নামে

নিজেদের দিকে আহ্বান করে। সে কারণে সাধারণ মানুষ আল্লাহর ইবাদাত মনে করেই তাদের ইবাদাত করে থাকে।

এরা সাধারণত মানুষের থেকে দুভাবে ইবাদাত নেয়। আকীদা বা বিশ্বাসগতভাবে এবং আমলগতভাবে। যেমন তারা বলে, পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরয।[৫৩] অথচ ফরয বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোন ইবাদাতকে ফরয বলা যায় না।

পীর-সুফিগণ মনগড়া ইবাদাত তৈরি করে। যা কুরআন-হাদীসে নেই।

এছাড়াও তারা বহু তরীকা আবিষ্কার করেছেন। আবার এগুলোর জন্য এক এক তরীকার এক এক যিকির। আবার সেই যিকিরের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও অঙ্গভঙ্গি। এ সবকিছুই আল্লাহর শরীয়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক শরীয়াত, যা পীর-সুফিগণ নিজেরা তৈরি করেছেন। অথচ এ জাতীয় শরীয়াত তৈরি করার অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

তাদের কি এমন কতকগুলো শরীকও আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? (সূরা শূরা- ২১)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে নতুন কোন শরীয়াত তথা ইবাদাতের পদ্ধতি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়াতের ভেতর বহু তরীকার কোন স্থান নেই। সুতরাং আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের বিপরীতে কেউ কোন হুকুম দিলে তা মান্য করা যাবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না।[৫৪]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর শরীয়াতের বিপরীতে কারো আনুগত্য করা যাবে না। হোক সে মা-বাপ, বড় ভাই, পীর-মুর্শিদ, আমির-উমারা। তবে যদি তারা আল্লাহর শরীয়াতের অনুকূলে কোন হুকুম করে তবে তা মান্য করা অপরিহার্য।

পীর-সুফিদের আকীদা-বিশ্বাস হলো আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইতে হলে পীরদের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় করে আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চায়, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সরাসরি ক্ষমা করেন না।

---

[৫৩] মাওয়াজে এছহাকিয়া, পৃ: ৫৫।

[৫৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩৪৪০৬; মুসনাদুল হারেস, হা/৬০২; মুজামুল আওসাত, হা/৩২১; জামেউস সাগীর, হা/৯৯০৩।

ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা বইয়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "বান্দা অসংখ্য গোনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাকে কুবল করতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দু'আ করবেন, যাতে তিনি কবুল করে নেন। ঐ দু'আর বরকতে আল্লাহ পাক তাকে কবুল করে নেন।" অথচ আল্লাহর কালামে এমন কোন কথা নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

আর যদি কেউ কোন মন্দকাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে; অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। (সূরা নিসা- ১১০)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত বলছে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি গোনাহগারদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এখানে কোন মাধ্যমের শর্তারোপ করা হয়নি। কেউ যদি অসীলা নিতে চায় তবে যেসব বিষয়ের অসীলা নেয়া জায়েয সেগুলোর অসীলা নিতে হবে। যেমন কোন নেক আমল করে আল্লাহর কাছে অসীলা নিতে পারে। যেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি বিপদে পড়ে তারা নিজেদের নেক আমলের অসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।[৫৫]

কোন মৃত ব্যক্তি চাই সে যত বড় ওলী বুযুর্গ বা নবীই হন না কেন– তাদের অসীলা নেয়া বা তাদের অসীলা নিয়ে দু'আ করা জায়েয নেই।

বর্তমানে পীর-মুরিদীর যে সিলসিলা দেখা যাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এর মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদেরকে মুরিদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের বিনা পুঁজির ব্যবসা সাজিয়ে বসেছে।

এই পীর-মুরিদীকে কেন্দ্র করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদাত ইসলামে প্রবেশ করেছে। মাজার পূজা, কবর পূজা, গাছ পূজা, মাছ পূজা, কচ্ছপ পূজা, কুমীর পূজা, গজার মাছ পূজা, খাজা বাবা, গাজা বাবা, লেংটা বাবা, বান্দা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফেদরাজ, গেছোঁদরাজ, মুশকিলকুশাঁ, হাজতরাওয়াঁ, গাউস-কুতুব, আকতাব, আবদাল, গাউসুল আযম ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে এদের ইবাদাত করা হয়।

যাদের নামে এগুলো করা হচ্ছে তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় এগুলো করার জন্য আদেশ করে গিয়ে থাকেন অথবা তাদেরকে কেন্দ্র করে এ ধরণের শিরক-বিদআত করা হতে পারে এ কথা জানা সত্ত্বেও যদি নিষেধ না করে থাকেন তাহলে তারা তাগুত বলে বিবেচিত হবেন। আর যদি তারা এগুলো নিষেধ করে গিয়ে থাকেন অথবা তাদের অজান্তেই এসব করা হয় তাহলে তারা তাগুত বলে গণ্য হবেন না। এ ক্ষেত্রে যারা এগুলো করেছে শুধুমাত্র তারাই গোনাহগার হবে।

---

[৫৫] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩৩।

এ প্রসঙ্গে ঈসা (আঃ) এর বিষয়টি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ঈসা (আঃ) কেও খ্রিস্টানরা আল্লাহর পুত্র দাবি করে তার ইবাদাত করেছে। কিন্তু এজন্য ঈসা (আঃ) কে তাগুত বলা যাবে না। কেননা তিনি এগুলো করতে বলেননি এবং তাঁর এগুলো জানাও ছিল না। পবিত্র কুরআনে রয়েছে,

﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۚ بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۚ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ﴾

যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের ছেলে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে দুজন ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো? তখন সে বলবে, তুমি মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমি তো তা জানতে। তাছাড়া আমার অন্তরের কথা তুমি তো অবগত আছই, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই। নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা মায়েদা- ১১৬)

৫. اَلسَّاحِرُ (যাদুকর)

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় অথবা আল্লাহর কোন বিশেষ ক্ষমতা কেউ নিজের জন্য দাবি করে সে-ই তাগুত। এদের মধ্যে অন্যতম হলো, اَلسَّاحِرُ তথা যাদুকর।

اَلسِّحْرُ (আস সিহর) শব্দের অর্থ হচ্ছে, اَلشَّيْءُ الْخَفِيُّ তথা গোপন ও সুক্ষ্ম বস্তু, ধোঁকা, ভেল্কিবাজি ও কৌশল ইত্যাদি। পরিভাষায় যাদু হচ্ছে,

اَلسِّحْرُ مَا خَفِيَ وَلَطِفَ سَبَبُهٗ

অর্থাৎ যাদু এমন একটি বস্তু, যার কারণ সুক্ষ্ম ও অদৃশ্য।[৫৬]

মোটকথা, যাদু হচ্ছে এমন কিছু মন্ত্র এবং ঝাড়ফুঁক, যা দেহ বা মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ অসুস্থ হয়, মারা যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করার মতো নিকৃষ্ট কাজ সংঘটিত হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ﴾

অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। (সূরা বাকারা- ১০২)

---

[৫৬] ফাতহুল মাজীদ, ৩৯৫ নং পৃঃ।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। (সূরা ফালাক- ৪)

যাদুর প্রকারভেদ :

যাদু দুই প্রকার : (১) হাক্বিক্বী এবং (২) তাখঈলী।

(১) হাক্বিক্বী যাদু এমন কিছু আমল, যা মানুষের দেহ অথবা মনের ভেতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যাতে মানুষ অসুস্থ হয়, মরে যায় অথবা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় অথবা কোন কাজ করে ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ প্রকারের যাদু করা হয়েছিল।

(২) তাখঈলী যাদু হচ্ছে, যে যাদু চোখ এবং দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। যার কারণে কোন বস্তুকে বাস্তবতার বিপরীত দেখে। ফিরাউনের যাদুকররা মূসা (আঃ) এর সাথে এ প্রকারের যাদু করেছিল। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى﴾

অতঃপর তাদের যাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো, যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (সূরা ত্বা-হা- ৬৬)

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾

যখন তারা নিজেদের যাদু ছাড়ল, তখন তা দ্বারা লোকদের চোখে যাদু করল এবং তাদের আতঙ্কিত করে তুলল। (সূরা আ'রাফ- ১১৬)

এখানে আল্লাহ তা'আলা 'মানুষকে যাদু করল' না বলে 'মানুষের চোখে যাদু করেছে' বলেছেন।

যাদুর শরয়ী বিধান :

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তারই অনুসরণ করছে। সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তবে তারা উভয়ে কাউকে তা ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ কথা না বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব, তুমি কুফরী করো না; অথচ তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত যা দ্বারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। তবে তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা শিক্ষা করত এমন বিষয়, যা তাদের ক্ষতি করে এবং কোন উপকার করে না। আর নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট যদি তারা তা জানত। আর যদি তারা ঈমান আনত এবং ভয় করত, তবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ লাভ করত, যদি তারা এটা বুঝত! (সূরা বাকারা- ১০২, ১০৩)

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে,

১. যাদু শিক্ষা দেয়া একটি কুফরি কাজ এবং তা শয়তানের শিক্ষা। কোন নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া ও ভালো মানুষের কাজ নয়। এগুলো শয়তানের কাজ।

২. "তারা উভয়ই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য আগমন করেছি। সুতরাং তুমি কাফির হয়ো না।" আয়াতের এ অংশ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাদু শিক্ষা করা একটি কুফরি কাজ।

৩. "তারা ভালোভাবে জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।" এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যাদু শিক্ষা করা কাফিরদের কাজ। আর কাফিরদের জন্য পরকালে কোন হিস্যা (জান্নাত) নেই। সুতরাং যাদু এমন একটা কুফরি কাজ, যা দ্বারা জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

৪. "যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হতো" আয়াতের এ অংশ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদু ঈমান ও তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ। যাদু শিক্ষা করলে ঈমান ও তাকওয়া থাকে না।

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট হলো যে, নিজে যাদু শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়া উভয়টিই কুফরি কাজ। যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। তাছাড়া আরো প্রমাণিত হলো যে, যাদু একটি ঈমানের পরিপন্থী কাজ এবং তা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে একটি। কেননা যাদুকররা মনে করে যে, তারা মানুষের লাভ-ক্ষতির অধিকারী, ইচ্ছে করলেই তারা কারো উপর বিপদাপদ নাযিল করতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে কারো থেকে বিপদাপদ দূর করে দিতে পারে। অথচ এ কাজগুলো একান্তই আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু যাদুকররা আল্লাহর এ সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেদেরকে দাবি করে এবং মানুষ তাদের এসব কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করে তাই যাদুকররাও তাগুত।

اَلْكَاهِنُ (আল কাহিন) গণক বা জ্যোতিষী :

كَاهِنٌ (কাহিন) ঐ সকল গণক বা জ্যোতিষীকে বলা হয়, যারা হস্তরেখা দেখে অথবা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এবং তারকার উদয়-অস্তাচলের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন লক্ষণ দেখে বা তিথী গণনা করে অথবা শয়তানদের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং ইলমে গায়েবের দাবি করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিন এবং শয়তানরা তাদের মানব বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন খবর পৌঁছায়। সে অনুযায়ী ঐ শয়তানের বন্ধুরা ও জ্যোতিষীরা আগাম খবর দেয়। কিন্তু মূর্খ অনুসারীরা এটাকে কাশফ এবং কারামত মনে করে। আর এভাবেই অনেক মানুষ এদেরকে আল্লাহর ওলী মনে করে ধোঁকা খায়। বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এদের উৎপাত জাহেলী যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেউ পাগড়ি পরে বিজ্ঞাপন দেয় যে, তিনি অমুক দরবারের এত বছরের খাদেম, যিনি আপনাকে দেখামাত্র অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু বলে দেবেন। আবার কেউ সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে নিজেকে শাহ সাহেব অথবা জিন হুজুর দাবি করে সর্বরোগের মহাচিকিৎসক হিসেবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন এবং বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। আর মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। সেদিন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হবে, যদি আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা না করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত। (সূরা আনআম- ১২৮)

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে সকল পীর-বুযুর্গ আর জিন হুজুররা জিনদের মাধ্যমে বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে মানুষের সামনে নিজেদের কারামত প্রকাশ করে, তারা কিয়ামতের দিন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হাদীসে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

আবু হুরায়রা ও হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন গণক অথবা জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল।[৫৭]

যেহেতু গণক নিজেকে عَالِمُ الْغَيْبِ (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বলে দাবি করে, যা একান্তই আল্লাহর কাজ এবং গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই রাখেন সে কারণে সে বাতিল ইলাহ এবং বাতিল রব হিসেবে গণ্য হয়। আর যেহেতু সে এর মাধ্যমে লোকদেরকে নিজের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে এ কারণে সে তাগুত।

৬. اَلْهَوٰى (হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ)

তাগুতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি তাগুত হলো اَلْهَوٰى (হাওয়া) বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে এই হাওয়া নামক তাগুত অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে যখন তার হাওয়ার বিপরীতে কোন হুকুম করা হয় তখন আল্লাহর হুকুম পালন না করে নিজ হাওয়ার হুকুম পালন করে। এভাবে সে আল্লাহর পরিবর্তে হাওয়া তথা প্রবৃত্তির ইবাদাত করে। আর আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করা হয় সেই তাগুত। অতএব হাওয়া একটি তাগুত।

اَلْهَوٰى শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

اَلْهَوٰى শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, আকৃষ্ট হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া ইত্যাদি। আর এটা ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। তবে সাধারণত মন্দ কাজে ইচ্ছা করার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার করা হয়। পরিভাষায় হাওয়া বলা হয়, মনে মনে কোন কিছুকে ভালোবেসে তাকে পাওয়া, অর্জন করা বা আনুগত্য করা।

اِتِّبَاعُ الْهَوٰى বা প্রবৃত্তির অনুসরণ দুই প্রকার :

১. اَلْهَوٰى بِمَعْنَى الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ الْمُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ অর্থাৎ হাওয়া অর্থ হচ্ছে, বড় কুফর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ প্রকার হাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

[৫৭] মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৫৩৬; বায়হাকী, হা/১৬৯৩৮।

﴿اَفَرَاَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلۡمٍ وَّخَتَمَ عَلٰی سَمۡعِهٖ وَقَلۡبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَۃً ؕ فَمَنۡ یَّهۡدِیۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ﴾

তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তার চক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে আছে, যে তাকে হেদায়াত করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা জাসিয়া- ২৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَرَءَیۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنۡتَ تَکُوۡنُ عَلَیۡهِ وَکِیۡلًا﴾

তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর না, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও? (সূরা ফুরক্বান- ৪৩)

আল্লাহ তা'আলা হাওয়ার অনুসরণ করা ক সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَیۡرِ هُدًی مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। (সূরা ক্বাসাস- ৫০)

অর্থাৎ মানুষকে গোমরাহ করার মতো যত জিনিস আছে, তার মধ্যে মানুষের هَوٰى বা নফসই হচ্ছে সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। কারণ শয়তানকেও শয়তান বানিয়ে ছিল এই নফস। কেননা তখন শয়তানকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অন্য কোন শয়তান ছিল না। বরং তার নফসই তাকে বলতে শিখিয়েছিল- اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّخَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِیۡنٍ (আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি হতে)। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের هَوٰى বা প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে, তার জন্য আল্লাহর বান্দা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যাবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, সে কেবল সে কাজই করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনো প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তা'আলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কোন পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলাকে তার একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا – أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর না, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুর মতোই, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট! (সূরা ফুরক্বান- ৪৩, ৪৪)

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায়, যে পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষ এমন এক শ্রেণির পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায় তখন সে এমনসব কাজ করে, যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়। মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। এ জাতীয় মানুষের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

তুমি তার আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে অমনোযোগী করে দিয়েছি। অতঃপর সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে। (সূরা কাহফ- ২৮)

উপরোক্ত আয়াতে যারা নিজের হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. اَلْهَوٰى بِمَعْنَى الْفُسُوْقِ اَوِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِيْ هِيَ دُوْنَ الْكُفْرِ الْاَ كْبَرِ অর্থাৎ সাধারণ পাপ এবং নাফরমানী, যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট। আর এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা (বিচার করতে গিয়ে) পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখো) তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন। (সূরা নিসা- ১৩৫)

কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারীর পুরস্কার হলো জান্নাত :

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযি'আত- ৪০)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুক্বাতিল (রহ.) বলেন,

هُوَ الرَّجُلُ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ لِلْحِسَابِ فَيَتْرُكُهَا

অর্থাৎ "হাওয়া তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা গোনাহ্ করার ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু কিয়ামত দিবসে হিসাব নিকাশের কথা স্মরণ করে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উক্ত গোনাহ থেকে বিরত থাকে।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য উপরোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাই হাওয়া নামক তাগুতকে বর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য খুবই জরুরি।

৭. تَقْلِيْدُ الْاٰبَاءِ (তাক্বলীদুল আবা)

তাগুতগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাগুত হলো تَقْلِيْدُ الْاٰبَاءِ (তাক্বলীদুল আবা) অর্থাৎ বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করা। বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা যত রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার রয়েছে, সেগুলোকেই শক্তভাবে ধরে রাখা, তা যতই গর্হিত ও কুরআন-সুন্নাহবিরোধী হোক না কেন এটা কোন নতুন রোগ নয়। পূর্ব যুগের উম্মতরাও এই একই রোগে আক্রান্ত ছিল।

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যখনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ তথা হক্বের দিকে আহ্বান করেছেন তখনই তারা পূর্বপুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে বলত, এটা পূর্বপুরুষ হতে চলে এসেছে, অমুক অমুক বড় বড় বুযুর্গ এ কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? অথচ কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ– قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ﴾

অনুরূপভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই তাদের সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। তিনি (নবী) বলতেন, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম পথনির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি (তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে)? তখন তারা বলত, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। (সূরা যুখরুফ- ২৩, ২৪)

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে, বরং আমরা তাঁরই অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি। অথচ (এ ব্যাপারে) তাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না। (সূরা বাক্বারা- ১৭০)

এ আয়াতে যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা হলো মূর্খ লোকেরা আসমানি কিতাবের ইলিম না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে। তাদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন রকম তরীকার যিকির-আযকার, অযীফা ও মিলাদ ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছিল। মানুষ এগুলোকেই দ্বীনের মৌলিক কাজ হিসেবে পালন করতে থাকে। পরবর্তীতে যখন সহীহ আলেমগণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় তখন তারা এ আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম কটূক্তি, সমালোচনা, গালি-গালাজ ও অপবাদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং জনগণকে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়।

নূহ (আঃ) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তাদের জাতির উচিৎ ছিল এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সাদরে গ্রহণ করা। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে গোটা জাতিকে নূহ (আঃ) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিল। আর সেজন্য তারা কিছু নেক্কার লোকদের নাম উল্লেখ করল, যারা ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছিল। লোকেরা তাদের মূর্তি তৈরি করে তাদের ইবাদাত করত। কুরআনে এসেছে,

﴿وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا﴾

তারা (একে অপরকে) বলেছে, তোমরা কখনো তোমাদের উপাস্যগুলোকে এবং ওয়াদ, সুওয়াআ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে পরিত্যাগ করো না। (সূরা নূহ- ২৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ (আঃ) তার জাতিকে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি কারো নাম নেননি। কারো বিরুদ্ধে বক্তব্য দেননি। কিন্তু তার জাতি সাধারণ মানুষদের উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহওয়ালাদের নাম উল্লেখ করেছে।

সালেহ (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার সম্প্রদায় যে উত্তর দিয়েছিল তা হলো-

﴿قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهَانَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ﴾

তারা বলল, হে সালেহ! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের বিশ্বস্ত। তুমি কি আমাদেরকে তাদের ইবাদাত করতে নিষেধ করছ, যাদের ইবাদাত করত আমাদের পিতৃপুরুষরা? অবশ্যই আমরা সে বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ। (সূরা হুদ- ৬২)

শু'আইব (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তারা উত্তরে বলেছিল,

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾

তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এ নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে, অথবা আমরা আমাদের ধনসম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও (বর্জন করতে হবে)? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু ও ভালো মানুষ। (সূরা হুদ- ৮৭)

যেহেতু লোকেরা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য করে যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয় তাই তারাও তাগুত। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয় সেই তাগুত। যদি এসকল পূর্বপুরুষ তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে গোমরাহী কাজের দিকে আহ্বান না করে থাকেন এবং তারা তাদের কাজে সন্তুষ প্রকাশ না করে থাকেন তবে তারা গোনাহগার হবে না। এ ক্ষেত্রে কেবল অনুসারীরাই গোনাহগার হবে।

ঈমানের ক্ষতি সাধনকারী বিষয়সমূহ

ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী বিষয়সমূহ হলো বান্দার পাপ। পাপ তার কমবেশি হওয়ার দিক থেকে ঈমানের উপর প্রভাব ফেলে। পাপের মাত্রা যত বাড়বে তার ঈমান ততবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি বান্দা যদি কুফরী পর্যায়ের পাপ করে বসে অথবা পাপকে হালাল মনে করে, সেটা অন্তর দ্বারা হোক, জিহ্বার দ্বারা হোক অথবা অঙ্গের দ্বারা হোক তবে তা তাকে ঈমান থেকে বের করে দেয়। তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতানুযায়ী কুফর ও শিরক ব্যতীত অন্যান্য পাপসমূহ দুভাগে বিভক্ত।

১. কবীরা গোনাহ। ২. সগীরা গোনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾

অপরাধীরা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এটা কেমন গ্রন্থ! এতে তো কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ কোনকিছুই বাদ দেয়া হয়নি; বরং সবকিছুই রেখে দেয়া হয়েছে। (সূরা কাহফ- ৪৯)

১. কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা :

اَلْكَبِيرَةُ: هِيَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا. أَوْ عُقُوبَةٌ. أَوْ تَوَعُّدٌ بِالنَّارِ. أَوْ عَذَابٌ. أَوْ لَعْنَةٌ. أَوْ غَضَبٌ

কবীরা ঐ সকল গোনাহকে বলা হয়, যার জন্য দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে অথবা যার জন্য জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা যে পাপের জন্য লানত বা অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে অথবা যে পাপের জন্য আল্লাহর গযবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সগীরা গোনাহের সংজ্ঞা :

اَلصَّغِيْرَةُ : هِيَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا. وَلَا وَعِيْدٌ فِي الْاٰخِرَةِ

সগীরা ঐ সকল গোনাহকে বলা হয়, যার জন্য দুনিয়াতে কোন হদ্দ বা শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি এবং পরকালেও কোন আযাবের হুমকি দেয়া হয়নি।

যেসব কারণে সগীরা গোনাহ কবীরা গোনাহে পরিণত হয় :

১. অনবরত গোনাহ করতে থাকা।

২. গোনাহকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করা।

৩. সগীরা গোনাহ করে আনন্দ লাভ করা এবং গর্ব করা।

৪. সগীরা গোনাহকারী যদি আলিম হয়, তবে তার এই সগীরা গোনাহ কবীরা গোনাহে চলে যায়। কেননা মানুষ তার অনুসরণ করে থাকে।

৫. সগীরা গোনাহ অনেক সময় কবীরা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনুল আম্বারী তার কবিতায় বলেন,

خَلِّ الذُّنُوْبَ حَقِيْرَهَا وَكَثِيْرَهَا فَهُوَ التُّقٰى

كُنْ مِثْلَ مَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرٰى

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰى

তুমি পাপকে ছেড়ে দাও, তা ছোট হোক আর বড় হোক। এটাই হলো তাক্বওয়া।
তুমি এমন হও, যেমন কোন কাটাযুক্ত রাস্তা দিয়ে কেউ চলাচল করে
আর সে কাটাবিদ্ধ হওয়ার ভয় করে।
তুমি কোন সগীরা গোনাহকে হালকা মনে করো না।
কেননা পাহাড় বালুকণা থেকেই হয়।[৫৮]

ইবনে মুবারক তার কবিতায় বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوْبَ تُمِيْتُ الْقُلُوْبَ وَيُتْبِعُهَا الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوْبِ حَيَاةُ الْقُلُوْبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

আমি দেখেছি যে, পাপ অন্তরকে মেরে ফেলে।
আর লাঞ্ছনা পাপীর সাথে লেগে থাকে।
পাপ ত্যাগ করলে অন্তর জীবন লাভ করে।
সুতরাং পাপ ত্যাগ করো– এটাই তোমার জন্য উত্তম।[৫৯]

---

[৫৮] শু'আবুল ঈমান, ৬৯১৯।
[৫৯] শু'আবুল ঈমান, ৬৯১৮।

গোনাহের পুনরাবৃত্তির হুকুম :

কোন গোনাহ বারবার করা অথবা গোনাহের মধ্যে ডুবে থাকা বা অনবরত গোনাহের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং গোনাহ থেকে বিরত না হওয়া, তওবা ইস্তেগফার না করা এবং গোনাহের কাজে আনন্দ লাভ করা– এসব কাজ কবীরা গোনাহের পর্যায়ে পড়ে। এগুলো যদি সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে তবে তা কবীরা গোনাহের পর্যায়ে চলে যায়। কেননা ধারাবাহিকভাবে পাপ কাজে অনবরত ডুবে থাকার ফলে বান্দার অন্তর পাপে ছেয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তার অন্তরে আর ঈমান থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

হ্যাঁ, যে পাপ অর্জন করবে এবং তাঁর পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আর সে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারা- ৮১)

আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন যারা পাপের পুনরাবৃত্তি করে না :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের জীবনের প্রতি অত্যাচার করে ফেলে, তৎক্ষনাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে (তারাই মুমিন)। আর আল্লাহ ব্যতীত কে আছে, যে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা (পাপ) করেছে, তার উপর জেনে-শুনে অটল থাকে না। (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

সগীরা গোনাহকে হালকা মনে করা যাবে না :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُوْدِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُوْدِ حَتَّى جَمَعُوْا سَوَادًا فَأَجَّجُوْا نَارًا وَأَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে পাপকে হালকা মনে না করা। কেননা এ সকল পাপ যখন কোন বান্দার উপর একত্র হয়, তখন তা তাকে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর নবী ﷺ একটি সম্প্রদায়ের উদাহরণ পেশ করলেন যে, তারা একটি খোলা ময়দানে অবতরণ করল। অতঃপর খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য বাবুর্চি আসল। অতঃপর তাদের একজন লাকড়ি সংগ্রহ করতে গেল এবং সে তা নিয়ে আসল। আর আরো একজন গেল সেও কিছু নিয়ে আসল।

অতঃপর দেখা গেল যে, লাকড়ির একটি বোঝাই জমা হয়ে গেল। অতঃপর তারা আগুন জালাল এবং তাদের কাজ সমাধা করল।[৬০]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি ছোট পাপ থেকে সাবধান থাকো। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে এরও অনুসন্ধানকারী রয়েছে।[৬১]

প্রতিটি গোনাহের ফলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوْ قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যখন কোন গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে তা হতে বিরত হয় এবং তওবা করে তখন তার অন্তর খালি হয়। কিন্তু যদি সে আবার পাপ করে তাহলে ঐ দাগ আরো বাড়তে থাকে। এমনকি এই দাগে তার অন্তর ছেয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে সেই দাগ যার কথা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সাবধান! তারা যা পাপ অর্জন করেছে তার ফলে তাদের অন্তর বেকে গেছে"।[৬২]

মুমিন গোনাহকে অত্যধিক ভয় করে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى أَنْفِهِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, মুমিন তার পাপকে এ রকম দেখে যে, একটি পাহাড় তার মাথার উপর ঝুলে আছে। সে ভয় করে যে, কখন তা তার উপর পড়ে যায়। আর অপরাধী তার পাপকে এ রকম দেখে যে, যেমন একটি মাছি তার উপর দিয়ে উড়ে গেল।[৬৩]

কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না তবে দুনিয়াতে সে ক্রুটিপূর্ণ ঈমানদার থাকে।

---

[৬০] মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৮১৮।
[৬১] দারেমী, হা/২৭৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৪১৫।
[৬২] তিরমিযী, হা/৩৩৩৪।
[৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৩০৮।

পাপের পরিণাম

কোন পাপ করলে দুনিয়া অথবা আখিরাতে বান্দা এর পরিণাম ভোগ করে থাকে। পাপের কয়েকটি পরিণাম হচ্ছে,

১. দ্বীনের ইলিম থেকে দূরে থাকা। কেননা দ্বীনী ইলিম হচ্ছে আল্লাহর নূর, তার অবস্থানস্থল হলো বান্দার অন্তর। কিন্তু যখন এই অন্তর পাপে ভরে যায়, তখন ইলিম আর সেখানে স্থান পায় না, পাপ সে ইলিমকে বের করে দেয়।

২. পাপের প্রতিক্রিয়া বান্দাকে একধরণের নিঃস্ব করে দেয়া, যা সে নিজে নিজে অনুভব করতে পারে। কারণ কোন বান্দা যখন পাপাচারী হয় তখন ভালো মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতে পারে না। অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়, যার ফলে বান্দা আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থাকে।

৩. পাপ মানুষের হায়াত কমিয়ে দেয় এবং বরকত উঠিয়ে দেয়।

৪. এক পাপ আরেক পাপের দিকে আকৃষ্ট করে, যেভাবে একটি নেকী আরেকটি নেকীর দিকে আকৃষ্ট করে।

৫. পাপ বান্দাকে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ করে দেয় এবং তার মর্যাদা নিচে নামিয়ে দেয়।

৬. একজনের পাপের প্রতিক্রিয়া অন্য মানুষের উপর, এমনকি পশুপাখি ও উদ্ভিদের উপরও পড়ে।

৭. পাপ মানুষের বিবেককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৮. পাপের কারণে বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপের উপযুক্ত হয়।

৯. পাপের কারণে বান্দা ফেরেশতাদের দু'আ থেকে বঞ্চিত হয়।

১০. পাপের কারণে ভূমিধস, ভূমিকম্প এবং পৃথিবীতে অন্যান্য ফাসাদ এবং বিপর্যয় দেখা দেয়।

১১. পাপ মানুষের অন্তরের সজীবতা নষ্ট করে দেয়।

১২. পাপ মানুষের লজ্জা এবং অন্তরচক্ষু উঠিয়ে দেয়।

১৩. পাপ বান্দার নিয়ামতকে দূর করে দেয় এবং আল্লাহর শাস্তিকে টেনে আনে।

১৪. পাপের কারণে ব্যক্তি কবরের শাস্তি ভোগ করবে।

১৫. পাপের কারণে মানুষ হাশরের ময়দানে লাঞ্ছিত হবে। এমনকি হিসাব-নিকাশের পর যদি জাহান্নামী সাব্যস্ত হয় তাহলে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

পাপের কাফ্ফারা

কোন বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তাকে ঐ পাপের পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু কাজ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার দ্বারা বান্দা তার পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। যেমন-

১. দুনিয়াতে শাস্তি নির্ধারিত থাকলে তা প্রযোজ্য করা :

দুনিয়াতে কোন হদ্দ বা শাস্তি নির্ধারিত থাকলে তা তার জন্য প্রযোজ্য করা হলে, তা তার জন্য কাফফারাস্বরূপ হয়ে যাবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا. وَلَا تَسْرِقُوا. وَلَا تَزْنُوا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذٰلِكَ

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও বাই'আতে আক্বাবাতে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। (আকাবার রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বক্তব্য দিচ্ছিলেন এবং তাঁর আশপাশে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার হাতে এ কথার উপর শপথ গ্রহণ করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেলবে না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াবে না এবং কোন ভালো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হবে না। যারা এসব অঙ্গীকার পূরণ করবে তার পুরস্কার আল্লাহ দেবেন। আর কেউ যদি উপরোক্ত কাজসমূহ থেকে কোনটিতে জড়িত হয়ে যায়, আর এজন্য যদি আল্লাহর পক্ষ হতে তাকে পৃথিবীতে কোন শাস্তি দেয়া হয়, তবে তার জন্য তা কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কেউ এ ধরণের কোন কাজ করে, আর আল্লাহ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে এর পরিণাম আল্লাহর হাতে, আল্লাহ চাইলে তাকে এর জন্য শাস্তি দিতে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতের উপর শপথ গ্রহণ করি।[৬৪]

২. তওবা করা :

যদি বান্দা এমন কোন গোনাহ করে, যার জন্য দুনিয়াতে শরীয়াতের কোন হদ্দ বা শাস্তি নির্ধারিত নেই, তারপর সে ঐ গোনাহ থেকে খালিছভাবে তওবা করে তাহলে তা তার জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ হয়ে যাবে। বান্দার তওবা যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যে, সে খালিছভাবে তওবা করে এবং গোনাহের উপর লজ্জিত হয়। অতঃপর সে সেই গোনাহ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, অতীতের গোনাহ থেকে সে ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ গোনাহে লিপ্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার এই তওবা কবুল করেন এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

---

[৬৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৯২।

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾

যে ব্যক্তি তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ক্বাসাস- ৬৭)

﴿مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾

যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।(সূরা মারইয়াম- ৬০)

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

আল্লাহ এমনও নয় যে, তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (সূরা আনফাল- ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

যারা- যখনই কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের জীবনের প্রতি অত্যাচার করে ফেলে, তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে (তারাই মুমিন)। আর আল্লাহ ব্যতীত কে আছে, যে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা (পাপ) করেছে, তার উপর জেনে-শুনে অটল থাকে না। (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

উল্লেখিত আয়াত থেকে জানা যায় :

মুসলিমরা কোন পাপকাজ করার পর তাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর ভয়ে ব্যকুল ও অস্থির হয়ে উঠে। আর প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য। সংশোধন হয়ে যায় ভবিষ্যতের আগত দিনগুলোর জন্য।

তারা নিজেদের কোন পাপ কাজের উপর স্থির থাকে না। বরং তা পরিহার করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং এজন্য তাদের মন-মগজ লজ্জা ও অবমাননার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠে।

কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে এই গুণাবলি আদৌ বর্তমান থাকে না। তারা শরীয়াতের বিপরীত কাজগুলো নফসের কোন আকস্মিক আবেগ উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে করে না। বরং জেনে বুঝে ও সজাগ অনুভূতি নিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে করে। শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। তাদের অন্তরে তখন তওবা ও ইস্তিগফার দূরের কথা আল্লাহর ভয়-ভীতির নাম-গন্ধও বিদ্যমান থাকে না।

৩. নেক আমল করা :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা হলো, বান্দার নেক আমলের মাধ্যমে তার সগীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়। আর একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে

কবীরা গোনাহ ক্ষমা করা হয়। যদি বান্দা ইখলাছের সাথে নেক আমল করে এবং তার এই আমল কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, তবে তার এই নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

তুমি সালাত কায়েম করো– দিবসের দু'প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ। (সূরা হুদ- ১১৪)

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ﴾

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।[৬৫]

কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা :

কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সগীরা গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾

যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে সগীরা গোনাহ ব্যতীত। (সূরা নাজম- ৩২)

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের ছোট গোনাহসমূহ ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা- ৩১)

আমাদের আমলনামায় যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে আল্লাহ ছোটখাটো অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করেন। তবে যদি আমরা বড় বড় অপরাধ করে থাকি, তাহলে তিনি আমাদের ছোটখাটো অপরাধগুলোও হিসাবের মধ্যে গণ্য করবেন এবং সেজন্য পাকড়াও করবেন।

৪. বিপদাপদে পতিত হওয়া :

যখন কোন বান্দার উপর কোন বিপদাপদ আসে এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করে এবং তার নিজের ক্রটির জন্য ক্ষমা চায় তবে এই বিপদের ফলে আল্লাহ তাকে সওয়াব দান করেন এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি সে এই বিপদে আরো ক্রোধান্বিত হয়, তবে সে কোন সওয়াবও পায় না এবং তার কোন গোনাহও ক্ষমা করা হয় না।

---

[৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম রোগ যন্ত্রণা, কষ্ট, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, নির্যাতন ও পেরেশানীর শিকার হলে এমনকি তার একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৬৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনের সন্তানসন্ততি, ধন-সম্পদ ও নিজের উপর সর্বদা বিপদ আসতে থাকে। এমনকি শেষপর্যন্ত সে এমনভাবে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আর কোন গোনাহ বাকি থাকে না।[৬৭]

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

নেক আমল যেমন ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, অনুরূপ পাপ ঈমানকে কলুষিত করে। তবে কতক পাপ এমন রয়েছে যে, এর দ্বারা ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। এগুলোর কোন একটি বান্দার দ্বারা সংঘটিত হলে সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার উপর মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হয়। যদিও সে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈমানদারীর পরিচয় দিয়ে থাকে। যদি সে জীবিত থাকাবস্থায় তওবা করে এর থেকে ফিরে না আসে তবে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ সবাইকে হেফাযত করুন।

সাধারণত আকীদার কিতাবগুলোতে ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (ফলে) তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা- ৭২)

[৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১, ৫৬৭৪২।

[৬৭] তিরমিযী, হা/২৩৯৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৯২৪।

২. আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার মাঝখানে কোন মাধ্যম স্থির করা এবং তার কাছে সুপারিশ কামনা করা বা তার উপর তাওয়াক্কুল করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলো, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস- ১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা তাদের ইবাদাত এজন্য করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছে দেয়। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যুক ও কাফিরদেরকে হেদায়াত করেন না। (সূরা যুমার- ৩)

দুনিয়ার সকল কাফির ও মুশরিকরাও এ কথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যান্য সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং তাঁকেই সত্যিকার উপাস্য মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু, আমরা সেখানে কী করে পৌছতে পারি? তাই আমরা এসব দেবতাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি, যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে পৌছে দেয়।

৩. কাফিরদেরকে কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সঠিক বলে মনে করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবনব্যবস্থার অনুসরণ করবে তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না; আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
(সূরা আলে ইমরান- ৮৫)

৪. রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন সেই দ্বীন সম্পর্কে অথবা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতসমূহের সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে? এখন কোন ওজর পেশ করো না। কেননা তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের একদলকে ক্ষমা করি তবে আমি অপর দলকে শাস্তি প্রদান করব। কেননা তারা অপরাধী। (সূরা তাওবা- ৬৫, ৬৬)

৫. যাদু বা মন্ত্র করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তারই অনুসরণ করছে। সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। (সূরা বাক্বারা- ১০২)

৬. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের পক্ষ নেয়া এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু। (এরপরও) তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বাহ্যিক পরাজয় ঘটলে মুনাফিকরা ভাবল ইয়াহুদিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা দরকার। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আশ্রয় মিলবে। অতঃপর ইয়াহুদিরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইবনে উবাই তৎক্ষণাৎ তাদের পক্ষ অবলম্বন করল এবং বলল, আমি ভয় করি; কেননা অভাব অনটনের সময় তাদের ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। এ সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

৭. রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন সেই দ্বীনকে বা দ্বীনের কোন বিষয়কে অপছন্দ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ﴾

এটা এজন্য যে, যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে তারা তার অনুসরণ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এজন্য আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে বরবাদ করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ- ২৮)

৮. ভালোবাসার ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে। অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা এর চেয়ে দৃঢ়তর। (সূরা বাক্বারা- ১৬৫)

৯. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তার পরিবর্তে অন্য কোন জীবনব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। যারা মতভেদ করেছে তাদের জ্ঞান আসার পরেই পরস্পরের বাড়াবাড়ির কারণে তারা মতভেদ করেছে। আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান- ১৯)

১০. আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَاۤ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ﴾

যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা সাজদা- ২২)

তাওহীদ সংক্রান্ত ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ :

আবদুর রহমান ইবনে সালেহ আল মাহমুদ তাঁর রচিত "আল ঈমান হাকীকাতুহু, খাওয়ারিমুহু ওয়া নায়াকিযুহু" নামক কিতাবে ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার কিছু আলোচনা করা হলো :

তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কারো ভুল থাকে অথবা কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন আকীদা পোষণ করে অথবা কথা বলে অথবা আমল করে, যা তাওহীদের বিপরীত তাহলে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ঈমানের মূল বিষয়ই হচ্ছে তাওহীদ। অর্থাৎ ঈমানকে শিরকমুক্ত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি– নিরাপত্তা কেবল তাদের জন্যই এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (সূরা আন'আম- ৮২)

এখন যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর এই একত্ববাদকে কথায় হোক অথবা কাজে হোক অথবা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক অস্বীকার করে অথবা আল্লাহর গুণাবলিতে শরীক স্থাপন করে তাহলে সে মুমিন থাকে না। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে উদাসীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ﴾

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে। (সূরা ইউসুফ- ১০৬)

মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না। তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হতো যে, আসমান ও জমিনের মালিক কে? অথবা কে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? তখন তারা উত্তরে আল্লাহর কথাই বলত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾

আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, কে তোমাদেরকে আকাশ হতে রিযিক দান করে? অথবা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার হাতে? অথবা কে জীবিতকে মৃত হতে এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন? কে সকল বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা বলবে, এসব আল্লাহই করেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে বলুন, তারপরেও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা ইউনুস- ৩১)

তাওহীদের প্রকারভেদের আলোকে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণ :

প্রত্যেক এমন বিশ্বাস, কথা অথবা কাজ, যার দ্বারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতকে অথবা আংশিক রুবূবিয়্যাতকে অস্বীকার করা হয়– এমনসব কথা, কাজ বা বিশ্বাস দ্বারা ব্যক্তি ঈমান থেকে বেরিয়ে যায়। অথবা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের গুণে কেউ যদি নিজেকে গুণান্বিত করে তাহলেও সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন ফিরাউন বলেছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ আমিই সর্বোচ্চ রব।[৬৮] অথবা রাজত্বের মালিক হওয়ার দাবি করা অথবা রিযিকদাতা হওয়ার দাবি করা অথবা এগুলোকে আল্লাহ ছাড়া

---

[৬৮] সূরা নাযিয়াত- ২৪।

অন্য কারো উপর প্রযোজ্য করা। অনুরূপভাবে যেসব কাজ ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা কোন বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা– এসবই কুফরী। এগুলোর মাধ্যমে বান্দা ঈমান থেকে বেরিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ–

১. সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া অথবা জীবন ও মৃত্যু দেয়া– এসবের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক মনে করা।

২. এ আকীদা পোষণ করা যে, কেউ আল্লাহর সৃষ্টিকে রিযিক দানে সক্ষম অথবা রিযিক থেকে বারণ করতে সক্ষম অথবা আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে লাভ বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে– এসব আকীদা পোষণ করা।

৩. এ আকীদা পোষণ করা যে, বান্দার জীবনের সকল সফলতা তার নিজের চেষ্টা এবং কৃতিত্বের ফলাফল।

৪. এ আকীদা পোষণ করা যে, মানুষ আইন অথবা শরীয়াত প্রণয়নের অধিকার রাখে।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণ :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য অনেক নাম ও গুণাবলি নির্ধারণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি বিশেষভাবে গুণান্বিত। কোন ব্যক্তি যদি এসব গুণাবলির কোন একটি দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করে অথবা আল্লাহকে এমনভাবে গুণান্বিত করে, যা দ্বারা তার সিফাতের বিরোধিতা হয়, তাহলে তার এমন কাজ হবে কুফরী। এর উদাহরণ হলো–

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অথবা এর কিছু অংশ অস্বীকার করা অথবা আল্লাহর জন্য এমন কোন গুণ সাব্যস্ত করা, যা তাঁর নাম ও গুণাবলিকে সমর্থন করে না।

২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তার অর্থকে অস্বীকার করা অথবা তার সঠিক অর্থকে বিকৃত করা অথবা ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা তার মূল অর্থকে সরিয়ে ফেলা অথবা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি থেকে দূরে রাখা।

৩. সৃষ্টির সাথে আল্লাহর কোন গুণাবলির তুলনা করা অথবা আল্লাহকে এমন গুণে গুণান্বিত করা, যা তাঁর সাথে মানায় না। যেমন, আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা অথবা মনে করা যে, আল্লাহ ঘুমান, আল্লাহ ভুলে যান– এ রকম আরো যত ত্রুটিপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাওহীদে উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণ :

আল্লাহ তা'আলা হলেন একক সত্যিকার উপাস্য। তিনি ছাড়া অন্য যত উপাস্য রয়েছে সবই বাতিল। তারা কেউই ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এ আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করে অথবা এমন কোন কথা বলে বা এমন কোন কাজ করে, যা এই তাওহীদকে অস্বীকার করে অথবা এর কোনটিকে নিষেধ করে অথবা এর থেকে কোন কিছুকে ত্রুটিযুক্ত করে অথবা এর কোন কিছুকে অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করে, তবে সে অবশ্যই কুফরী করল এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। অধিকাংশ মানুষই অতীত ও বর্তমান সর্বযুগে এই তাওহীদে উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতকে অস্বীকার করে না।

বরং তারা এ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ তা'আলাই হলেন রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। কিন্তু তারা দাসত্বকে অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে। ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরকের কারণে আল্লাহ তা'আলা এসব লোকদেরকে কাফিরদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কারণ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই। সৃষ্টির কেউই এর উপযুক্ত নয়। মানুষের পরীক্ষার মূল বিষয় এটিই যে, বান্দা তার ইবাদাতকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কি না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

আমি জিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত- ৫৬)

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত না করতে। এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (সূরা ইউসুফ- ৪০)

আল্লাহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ :

দ্বীনে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান। চাই সেটা আকীদার ক্ষেত্রে অথবা ইবাদাতের ক্ষেত্রে হোক অথবা মুয়ামালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক অথবা চারিত্রিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে হোক। এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, কিসের মধ্যে বান্দার কল্যাণ এবং কিসের মধ্যে বান্দার অকল্যাণ রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর শরীয়াত পালন করা প্রত্যেক জ্ঞানবান ও সুস্থ বালেগ ব্যক্তির উপর ফরয। এর বিরোধিতা করা কোনভাবেই জায়েয নয় অথবা আল্লাহর বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে কোন অজুহাত পেশ করাও জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। এ উদ্দেশ্য যদি না থাকত, তাহলে মানুষ সৃষ্টির কোন অর্থ থাকত না।

আল্লাহ তা'আলার সকল বিধিবিধান অথবা এর মধ্যে কোন একটির বিরোধিতা করা অথবা আল্লাহর কোন বিধিবিধান থেকে বিমুখ হওয়া– এটা হচ্ছে কুফরী কাজ। কেননা ঈমানের চাহিদা হলো, আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বিরত থাকা। মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহর শরীয়াতের সামনে আত্মসমর্পণ করা, এর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং এ কথা বলা যে, আমি শুনলাম এবং মেনে নিলাম। বিশ্বাস করলাম এবং সত্যায়ন করলাম। এ ছাড়া আল্লাহর কোন আদেশ নিষেধের সামনে মুমিন ব্যক্তির কোন কথা থাকতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈসহ সকল নেক বান্দাদের উক্তি এমনই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

মুমিনদের উক্তি তো এই– যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম; মূলত তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর- ৫১, ৫২)

অন্যদিকে সর্বযুগে আল্লাহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কাফিরের চরিত্র হচ্ছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আল্লাহর শরীয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং আল্লাহর বিধিবিধানের ত্রুটি বের করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ - وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ - وَإِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ - وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ - وَمَآ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ - فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ - عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾

যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে কটাক্ষ করত। যখন তারা পরিবারের কাছে ফিরে যেত তখন আনন্দ করত। আর যখন তারা মুমিনদেরকে দেখত তখন তারা বলত, এরা পথভ্রষ্ট। অথচ এদেরকে (মুমিনদেরকে) তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করা হয়নি। আজ মুমিনগণ কাফিরদের নিয়ে উপহাস করছে এবং সুসজ্জিত আসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ২৯-৩৫)

সুতরাং আল্লাহর শরীয়াত তথা তার বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অথবা তাতে সন্তুষ্ট না হওয়া কুফরী। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আর এই বিমুখ হওয়া এবং আল্লাহর শরীয়াতের ত্রুটি বের করা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করাকেই বুঝায়। আর এটা হচ্ছে ঈমান ভঙ্গের এক বড় কারণ।

অনুরূপভাবে যেসব মুসলিম আল্লাহর শরীয়াত পালন করেন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা– এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করেন অথবা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা– এটাও কুফরী এবং ঈমান ভঙ্গের কারণ। কেননা এটা আল্লাহর দ্বীনের সাথে শত্রুতা এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার শামিল। আর আল্লাহর শরীয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার দ্বারা ব্যক্তি এটা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহর শরীয়াতে ত্রুটি রয়েছে। এজন্য সে পরোক্ষভাবে শরীয়াত প্রণেতা হওয়ার দাবিদার হয়ে যায়। এভাবে সে নিজেকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়।

আল্লাহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ তিনভাবে হয়ে থাকে। (১) বিশ্বাসগত (২) উক্তিগত ও (৩) কর্মগত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশ্বাস, কথা এবং

কাজের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াতের অথবা রাসূলের কোন সুন্নাতের ত্রুটি বের করা অথবা এটা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অথবা এটাকে মিথ্যারোপ করা অথবা এটা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা– এসবই ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো :

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈমান ভঙ্গের কারণ :

এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মুখে কোন কিছু বলুক অথবা না বলুক অথবা এ ব্যাপারে কোন কাজ করুক বা না করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু যদি এসব আকীদা পোষণ করে তবে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১. মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতকে অস্বীকার করা অথবা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। এমনকি তাঁর রিসালাতের কোন বিষয় অথবা তিনি শেষ নবী হওয়ার বিষয় অথবা তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার কোন কিছুকে অস্বীকার করা অথবা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা বিশ্বাস করার পর এর ত্রুটি অনুসন্ধান করা।

২. ইসলামের রুকনসমূহের কোন একটিকে অস্বীকার করা অথবা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

৩. ঈমানের ৬টি রুকনের মধ্য থেকে কোন একটিকে অস্বীকার করা অথবা জান্নাত, জাহান্নাম, পুরস্কার, শাস্তি অথবা জিন, ফেরেশতা অথবা নবী ﷺ এর মিরাজ– এসব অথবা এর কোন একটিকে অস্বীকার করা অথবা এতে সন্দেহ পোষণ করা।

৪. কুরআনের কোন কিছুকে অস্বীকার করা অথবা এ বিশ্বাস রাখা যে, কুরআনের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আছে।

৫. দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদির কোন একটিকে অস্বীকার করা।

৬. দ্বীনের কোন হারাম বিষয়কে হালাল মনে করা। যেমন– হত্যা, যিনা, সুদ ইত্যাদি হারাম বিষয়কে হারাম মনে করা।

৭. রাসূলগণের কোন একজনকে অস্বীকার করা, নিজে নবুওয়াত দাবি করা অথবা কেউ নবুওয়াত দাবি করলে তার সত্যায়ন করা।

৮. এ আকীদা পোষণ করা যে, ইসলামী শরীয়াত থেকে কোন কোন বিষয়ে বের হয়ে যাওয়া জায়েয এবং সে ক্ষেত্রে অন্য কোন বিধান পালন করা জায়েয আছে।

উক্তি বা কথার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গের কারণ :

১. আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়া অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গালি দেয়া অথবা ফেরেশতাদেরকে গালি দেয়া অথবা ইসলামকে গালি দেয়া।

২. আল্লাহ তা'আলা অথবা তাঁর কোন কথা অথবা কুরআনের কোন আয়াত অথবা তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৩. এ কথা বলা যে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই অথবা এ কথা বলা যে, ইসলামের বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অথবা এ কথা বলা যে, বর্তমান যুগে ইসলাম প্রযোজ্য নয়।

৪. এ কথা বলা যে, ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মুসলিমদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে অথবা তাদের দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে।

কর্মগত ঈমান ভঙ্গের কারণ :

১. কাফিরদের শি'আর তথা যেসব চিহ্ন কাফিরদের আলামত বহন করে সেসব চিহ্ন ধারণ করা। যেমন– গলায় ক্রুশ ঝুলানো, ক্রুশ অঙ্কিত পোষাক পরিধান করা, অগ্নিপূজকদের টুপি পরিধান করা, হিন্দুদের ধুতি পরিধান করা অথবা কপালে তিলক লাগানো ইত্যাদি।

২. ইসলামের কোন নিদর্শনের অবমাননা করা। যেমন– মসজিদের অবমাননা করা, কুরআন মাজীদের অবমাননা করা। কাফিরদের জন্য উপাসনালয় তৈরি করা অথবা কাফিরদেরকে তাদের ইবাদাতে সহযোগিতা করা।

৩. এমন কোন কাজ করা, যে ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত যে, এটা একমাত্র কাফিরই করতে পারে।

৪. কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া।

৫. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এককভাবে নির্ধারণ না করা। যেমন– আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়সালা করা।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা।

৭. আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করা।

৮. আল্লাহ যেভাবে মানুষের লাভ ও ক্ষতি করতে পারেন সেভাবে অন্য কাউকে লাভ-ক্ষতি প্রদানের উপযুক্ত মনে করা।

৯. কোন ইবাদাতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পালন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাওয়া।

১০. আল্লাহর বড়ত্বের সমান অন্য কাউকে বড় মনে করা। চাই সে ফেরেশতা হোক অথবা নবী হোক অথবা ওলী অথবা কোন কবরওয়ালা হোক অথবা কোন পাথর হোক অথবা কোন গাছ হোক।

১১. রুকূ, সিজদা, রোযা, তাওয়াফ, কুরবানী, মান্নত ও বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা।

১২. সালাত ত্যাগ করা। কেননা কোন ফরয আমল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা ঐ আমল পালনের প্রতি অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আর এটা অন্তরে ঈমান না থাকারই প্রমাণ বহন করে। আর সালাত হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় বিধান। এটাই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে যে পার্থক্যকারী জিনিস রয়েছে তা হলো, সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।[৬৯]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

আবদুল্লাহ ইবনে শাক্বীক্ব আল উকাইলী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথিগণ সালাত ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কিছুকে কুফরী হিসেবে মনে করতেন না।[৭০]

আবু হাতীম (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ সালাত ত্যাগকারীর উপর কুফর শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। কেননা সালাত ত্যাগ করা কুফরীর প্রথম ধাপ। যখন ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করে এবং সালাত ত্যাগ করাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয় তখন সে অন্যান্য ফরয ইবাদাতও ত্যাগ করে। আর যখন সে সালাত ত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন কার্যত সে সালাত অস্বীকারকারী হয়ে যায়। এজন্য নবী ﷺ সালাত ত্যাগকারীর শেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেই তার উপর কুফর শব্দ প্রয়োগ করেছেন।[৭১]

উপরোক্ত বিষয়গুলো হলো ঈমান ভঙ্গের কারণ। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব হলো সে যেন তার দ্বীনকে হেফাযত করে। অতএব সে মুখ দ্বারা এমন কোন কথা উচ্চারণ করবে না অথবা অন্তরে এমন কোন আকীদা পোষণ করবে না অথবা এমন কোন কাজ করবে না, যার কারণে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

যদি কোন সময় কারো দ্বারা ঈমান ভঙ্গের কোন কারণ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তার উচিত হলো তাড়াতাড়ি ঈমানকে নবায়ন করা, তওবা-ইস্তেগফার করা, লজ্জিত হওয়া এবং পরবর্তীতে আর যেন তা সংঘটিত না হয়, সে জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। কেননা বান্দার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ আল্লাহ রেকর্ড করে রাখছেন। আল্লাহর হিসাবের খাতা থেকে কিছুই বাদ পড়ছে না। এমনটি কখনো হবে না যে, বান্দা ঈমান ভঙ্গের কোন কাজ করল, অথচ তা তার ফেরেশতারা লিখে রাখেন না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرٰى بِهَا بَأْسًا يَهْوِيْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় কোন কোন ব্যক্তি এমন কিছু কথা বলে, যার পরিণাম সে লক্ষ করে না। অথচ এর ফলে সে জাহান্নামের আগুনের ৭০ বছরের (রাস্তা পরিমাণ) গভীরে চলে যায়।

---

[৬৯] তিরমিযী, হা/২৬২১; ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৯; সুনানে বায়হাকী আল কুবরা, হা/৬২৯১।

[৭০] তিরমিযী, হা/২৬২২; মিশকাত, হা/৫৭৯; রিয়াযুস সালিহীন, হা/৪৭০; জামেউল উসূল ফিল আহাদীস, হা/৩২৬৫।

[৭১] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৪৬৩।

اَلْكُفْرُ (আল কুফর) কুফরের পরিচয়

اَلْكُفْرُ (আল কুফর) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা। এটি ঈমান শব্দের বিপরীত।

শরীয়াতের পরিভাষায় : নবী ﷺ কর্তৃক আনীত বিষয়াদি, যা অকাট্যভাবে দ্বীনের অঙ্গ বলে প্রমাণিত– এসবের কোন একটি অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়। আর যে অস্বীকার করে তাকে কাফির বলে।

কাজেই আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর, কিয়ামত, আখিরাত, হাশর, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহকাম– যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এসবের কোন একটি অস্বীকার করা কুফরী।

কুফর দুধরণের :

(১) কুফরে আকবার বা বড় কুফরী ও (২) কুফরে আসগার বা ছোট কুফরী।

কুফরে আকবার বা বড় কুফরের পরিচয় :

যেসব কাজ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় তাকে কুফরে আকবার বা বড় কুফর বলা হয়। আর এগুলো বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত :

১. كُفْرُ التَّكْذِيْبِ বা মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে কুফরী করা :

কুরআন ও হাদীস বা এগুলোর কোন অংশকে মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এবং যখন তার নিকট সত্য আসে তখন তা প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার- ৩২)

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয় যালিমরা কখনো সফলকাম হবে না। (সূরা আন'আম- ২১)

এ আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা কাফির। অনুরূপভাবে যারা কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে তারাও কাফির। বর্তমানে অনেক নামধারী মুসলিম রয়েছে, যারা সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদিতে যথেষ্ট অগ্রগামী; কিন্তু কুরআনের দণ্ডবিধি যেমন চোরের হাত কাটার বিধান, সুদ হারাম হওয়ার বিধান, জিহাদ ফরয হওয়ার বিধান ইত্যাদি মানতে রাজি নয়। পবিত্র কুরআনে তাদেরকেও কাফির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾

তোমরা কি গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন। (সূরা বাক্বারা- ৮৫)

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি। আর তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, এরাই প্রকৃত কাফির। আর কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা- ১৫০, ১৫১)

২. كُفْرُ الْعِنَادِ তথা অস্বীকার ও অহংকার করার মাধ্যমে কুফরী করা :

এটা হলো সত্যকে জেনে-শুনে অহংকারবশত তার অনুসরণ না করা। ইবলিসের কুফরীটা এ প্রকারেরই ছিল। কেননা ইবলিস জেনে-শুনে অহংকারবশত সত্যকে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদা করেছিল। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাক্বারা- ৩৪)

৩. كُفْرُ الشَّكِّ তথা সন্দেহ করার মাধ্যমে কুফরী করা :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন কথা তথা ইসলামের নির্ধারিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করাই এ প্রকারের কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– কিয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ করা বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে না মানা। এ জাতীয় কাফিরদের বক্তব্যকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরেছেন।

﴿وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾

আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই, তবে নিশ্চয় আমি এর চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করব। (সূরা কাহফ- ৩৬)

৪. كُفْرُ الْاَعْرَاضِ তথা মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা বিমুখতার মাধ্যমে কুফরী করা :
ইসলাম যা দাবি করে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাস না করা। এ জাতীয় কাফির সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ﴾

যারা অস্বীকার করে ঐ সমস্ত জিনিসকে, যে সম্বন্ধে তাদেরকে ভয় দেখানো হয় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আহকাফ- ৩)

৫. كُفْرُ النِّفَاقِ তথা নিফাকীর মাধ্যমে কুফরী করা :
মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা এ প্রকার কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে– আমরা আল্লাহর উপর এবং বিচার দিনের উপর ঈমান আনয়ন করেছি; অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (সূরা বাক্বারা- ৮)

কুফরে আসগার তথা ছোট কুফরীর পরিচয় :
ছোট কুফর হচ্ছে, এমন কথা বা কাজ, যা কুফরী হলেও একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন, নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে কুফরী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللهِ
فَاَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴾

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও প্রশান্ত; সেখানে সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ গ্রহণ করালেন। (সূরা নাহল- ১১২)

এ আয়াতে বর্ণিত فَكَفَرَتْ (ফাকাফারাত) শব্দটি আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুফরীর পরিণাম :
ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে ঈমান চলে যায়। পূর্বে নামায, রোযা, হজ্জ, ইবাদাত-বন্দেগী যতকিছু করা হয়েছে সব বাতিল হয়ে যায়। বিবাহ নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তওবা করে পুনরায় মুসলমান হতে হবে।
কুফরী জঘন্য অপরাধ। তাই এর শাস্তিও কঠোর। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ - يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ - وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ - كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ নির্মিত মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করো। (সূরা হাজ্জ, ১৯-২২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ধ্বংস এবং আল্লাহ তাদের আমল নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করছে; তাই আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ- ৮, ৯)

যারা কুফরী করে, শয়তান তাদের অভিভাবক এবং তারা হলো জাহান্নামী। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

যারা কাফির তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা- ২৫৭)

اَلْمُرْتَدُّ (আল মুরতাদ) মুরতাদের পরিচয়

اَلْمُرْتَدُّ (আল মুরতাদ) শব্দটি আরবি رِدَّةٌ (রিদ্দাহ) শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ হলো, ফিরে যাওয়া, ঘুরে যাওয়া, ধর্ম ত্যাগ করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে যায় অথবা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে। মুরতাদের হুকুম হলো, তাকে হত্যা করতে হবে। তবে সে যদি পুনরায় ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাহলে সে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে নতুবা তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। পরকালে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল (বসবাস) করবে। (সূরা বাক্বারা- ২১৭)
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফরী করে, আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না। (সূরা নিসা- ১৩৭)
উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়। আবার মুসলিম হওয়ার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দ্বীন ও ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে কাফির হয় শরীয়াতের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়।
ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, অপরিহার্যভাবে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার করলে মুসলিম ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক অপরিহার্যরূপে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করল বস্তুত সে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনল এবং অংশ বিশেষকে অস্বীকার করল। এমতাবস্থায় সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা, যদি না সে তওবা করে ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ﷺ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রাঃ) এর নিকট কতগুলো যিনদিক ধরে আনা হলো। অতঃপর তিনি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলেন। এ সংবাদ ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছলে তিনি বললেন, এক্ষেত্রে আমি থাকলে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতাম না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাউকে দিও না। আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই হত্যা করতাম যাদের সম্বন্ধে নবী ﷺ বলেছেন, যে দ্বীনকে গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা করো।[৭২]

---

[৭২] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২২; তিরমিযী, হা/১৪৫৮; আবু দাউদ, হা/৪৩৫১; দারেমী, হা/৩২২৮; নাসাঈ, হা/৪০৬০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৫০৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৬২৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৭১।

اَلنِّفَاقُ (আন নিফাক্ব) মুনাফিকী

اَلنِّفَاقُ (আন নিফাক্ব) শব্দটি আরবী نَفَقٌ মূলধাতু হতে নির্গত। نَفَقٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সুড়ঙ্গপথ, যার একদিকে প্রবেশ করে অপরদিকে বের হওয়ার রাস্তা রয়েছে।

শরীয়াতের পরিভাষায় নিফাক্ব হচ্ছে, দ্বীন ইসলামের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসা। অন্য কথায়, বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করা; কিন্তু ভেতরে কুফর লুকিয়ে রাখা। যে নিফাক্ব করে তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

নিফাক্ব দুটি কারণে হতে পারে :

প্রথমত : সে ইসলামে প্রবেশ করেছে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি। বরং তার মন কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সে আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ নিয়েই ইসলামে প্রবেশ করেছে; কিন্তু এ সম্পর্কটি এতই দুর্বল যে, অন্যান্য সম্পর্ক তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

নিফাক্বের প্রকারভেদ : মুনাফিকী দুই প্রকার :

১. নিফাক্ব ফিল আকীদা বা বিশ্বাসগত নিফাক্বী :

যারা মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করত, কিন্তু তাদের অন্তকরণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফিক, যাদের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কঠোর ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা- ১৪৫)

আকীদাগত নিফাক্ব ৬ প্রকার :

১. রাসূল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
২. রাসূল ﷺ এর আনীত ওহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
৩. রাসূল ﷺ এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।
৪. রাসূল ﷺ এর আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
৫. রাসূল ﷺ এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।
৬. রাসূল ﷺ এর দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

২. নিফাক্ব ফিল আমাল বা কর্মগত নিফাক্বী :

যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এ দ্বিতীয় শ্রেণির নিফাককেই নিফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফিকী বলা হয়।

আমলগত নিফাক্ব চার প্রকার :

১. মিথ্যা কথা বলা। ২. ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করা। ৩. খিয়ানত করা। ৪. ঝগড়া করে গালি দেয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। (৩) আর যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।[৭৩]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে উক্ত স্বভাবগুলোর যে কোন একটি থাকবে তাহলে মনে করতে হবে, তার মধ্যে মুনাফিকীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে– যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা ত্যাগ না করে। উক্ত চিহ্নসমূহ হলো : (১) যখন আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে। (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (৩) যখন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে। (৪) আর যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয়।[৭৪]

اَلشِّرْكُ (আশ্‌শিরক) শিরকের পরিচয়

اَلشِّرْكُ (আশ্‌শিরক) শব্দের আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব করা, সমকক্ষ করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা, সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। পরিভাষায় যেসব গুণাবলি কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেসব গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত করা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করা শিরক। শিরকের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্যণীয় যে, এতে উভয় শরীকের অংশ সমান হওয়া জরুরি নয় বরং অল্পতে অংশীদার হলেও তাকে শরীক বলা হয়। তাই আল্লাহ তা'আলার হকের সামান্যতম অংশ অন্যকে দিলেই তা শিরকে পরিণত হবে। তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক।

[৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ২০৯৫; সহীহ মুসলিম, হা/২২০; তিরমিযী, হা/২৬৩১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৮৫।

[৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৪; সহীহ মুসলিম, হা/২১৯; তিরমিযী, হা/২৬৩২, আবু দাউদ, হা/৪৬৮৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৪৬৮।

শিরকের পরিণাম :

শিরকের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেছেন-

﴿وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ۖ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

স্মরণ করো, যখন লুকমান স্বীয় ছেলেকে বলেছিলেন, হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় যুলুম। (সূরা লুক্বমান- ১৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৭৫]

শিরক করে মারা গেলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না :

﴿اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক স্থাপন করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা নিসা- ৪৮)

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ ﷺ : حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهٖ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ : اَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ مُشْرِكَةٌ

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! হিযাব বা পর্দা কী? তিনি বললেন, মুশরিক অবস্থায় কারো মৃত্যু হওয়া।[৭৬]

শিরক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় :

﴿اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ﴾

যারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন; তাদের স্থায়ী আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা- ৭২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।[৭৭]

---

[৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৭; মুসলিম, হা/২৬৭; আবু দাউদ, হা/২৩১২; তিরমিযী, হা/৩১৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৬১২।

[৭৬] মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ইমাম হাকেম, হা/৭৬৬০।

[৭৭] বুখারী, হা/১২৩৮; মুসলিম, হা/২৭৮; মুসনাদে আহমদ, হা/৩৬২৫।

শিরক করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় :

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

নিশ্চয় তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন কর, তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার- ৬৫)

শিরকের কারণ :

১। আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা :

আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণাই শিরকের মূল কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ত্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ - أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ - فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কীসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মাবুদগুলোকে চাও? তাহলে সারা বিশ্বের রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? (সূরা সাফাফাত : ৮৫-৮৭)

২। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

তারা আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজকৃত– তাঁর ডান হাতে। অতএব তারা তাঁর সাথে যাকে শরীক করে তিনি তার থেকে অনেক পবিত্র ও মহান। (সূরা যুমার- ৬৭)

৩। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা :

﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾

বলো, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করতে আদেশ করছ? (সূরা যুমার- ৬৪)

শিরকের প্রকারভেদ

তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদকে বুঝায়। আর শিরক তার এ একত্ববাদকে নাকচ করে দেয়। তাওহীদ যেমন তিন প্রকার তার বিপরীত শিরকও তিন প্রকার। নিচে তা বর্ণনা করা হলো :

১। اَلشِّرْكُ فِي الرُّبُوْبِيَّةِ (আশ্‌শিরকু ফির-রুবূবিয়্যাহ) :

আল্লাহর ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বে কাউকে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, বিপদ থেকে মুক্তিদাতা বা সন্তানদাতা বলে মনে করা।

২। اَلشِّرْكُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (আশ্‌শিরকু ফিল আসমা ওয়াস সিফাত) :

আল্লাহর নাম এবং তাঁর গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরক করা। আল্লাহর গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলির তুলনা করা। তাছাড়া আল্লাহর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো সৃষ্টিরও আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন– আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্য জানে বলে বিশ্বাস করা।

৩। اَلشِّرْكُ فِي الْأُلُوْهِيَّةِ (আশ্‌শিরকু ফিল উলূহিয়্যাহ) :

তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা, সিজদা করা, অন্যের নামে মান্নত করা, অন্যকে আল্লাহর মতো ভয় করা, ভালোবাসা, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের কাছে বিচার চাওয়া ইত্যাদি।

স্তর হিসেবে শিরক তিন প্রকার

১। اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرِ (আশ্‌শিরকুল আকবার) বড় শিরক :

এটা হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মতো তার ইবাদাত করা ও আনুগত্য করা। এ প্রকার শিরক যে কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

২। اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرِ (আশ্‌শিরকুল আসগার) ছোট শিরক :

এটা হচ্ছে, আমল ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে শরীক করা। এ শিরক অনেক বড় কবীরা গোনাহ, কিন্তু এটি ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এটি মুখের কথার দ্বারা হতে পারে আবার কর্মের দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে। যেমন- এরূপ কথা বলা যে, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ এবং আপনার দান, আল্লাহ আর আপনার উপর ভরসা করছি ইত্যাদি।

৩। اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ (আশ্‌শিরকুল খফী) গোপন শিরক :

এটা হচ্ছে, হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কমূলক কথা, যার মাধ্যমে আল্লাহকেও গায়রুল্লাহর সমান করা হয়। এটি কখনো বড় শিরক আবার কখনো ছোট শিরক হতে পারে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। নবী ﷺ বলেন,

اَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ

অন্ধকার রাতে কালো পাথরে যেভাবে পিপিলিকার অবস্থান গোপন থাকে, শিরক তোমাদের মধ্যে ঐভাবে গোপন থাকে।[৭৮]

---

[৭৮] মুসনাদে রাবী' ইবনে হাবীব, হা/৮৭৯।

বড় শিরকের প্রকারভেদ

বড় শিরক চার প্রকার। আর তা হলো :

১। اَلشِّرْكُ فِي الدَّعْوَةِ (আশ্‌শিরকু ফিদ-দাওয়াত) আহবানের ক্ষেত্রে শিরক :
আল্লাহকে ডাকার মতো গায়রুল্লাহকে ডাকা। সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্য হোক কিংবা শুধু ইবাদাত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক। যেমন, জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায় উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রাণ ও পরলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা। কোন মৃত, কবরস্থ কিংবা অনুপস্থিত পীর দরবেশের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾
যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে। (সূরা আনকাবুত- ৬৫)

২। اَلشِّرْكُ فِي النِّيَّةِ (আশ্‌শিরকু ফিন নিয়্যাত) ইচ্ছা ও সংকল্পের ক্ষেত্রে শিরক :
আমলের মাধ্যমে গায়রুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা। এ প্রকার শিরক বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে। যে ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও শিরকে লিপ্ত হবে। আল্লাহর বাণী-

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। (সূরা হুদ- ১৫, ১৬)

৩। اَلشِّرْكُ فِي الطَّاعَةِ (আশ্‌শিরকু ফিত ত্বা'আত) আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক :
হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ বিধান বা হুকুম প্রদান করা আল্লাহর হক বা অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের আলিম ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্‌কেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। (কেননা) তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কতই না পবিত্র। (সূরা তাওবা- ৩১)

৪। اَلشِّرْكُ فِى الْمُحَبَّةِ (আশ্‌শিরকু ফিল মুহাব্বাত) ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরক :

আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, বান্দা গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সামনে বিনীত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই সে ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার সমান হোক বা কম বেশি হোক। এ প্রকার শিরকের উদাহরণ হলো, গাউস, কুতুব, পীর-ফকির, খাজা, দরগাহ, মাজার ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসা। অপর কিছু সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালোবাসা। পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা, যা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলিয়ে দেয় তাও এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদেরকে তেমনি ভালোবাসে যেমনটি কেবল আল্লাহকেই ভালোবাসা উচিত। আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে, তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক ভালোবাসবে। (সূরা বাক্বারা- ১৬৫)

একজন ঈমানদারের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্যসব সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। তার মধ্যে কোনকিছুর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যারা দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদের দাস, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। তাকে দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।[৭৯]

---

[৭৯] সহীহ বুখারী, হা/২৮৮৭; ইবনে মাজাহ, হা/৪১৩৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩২১৮; মুসনাদে বাযযার, হা/৮১২০।

প্রচলিত শিরকসমূহ

সমাজে অনেক ধরণের শিরক প্রচলিত রয়েছে। এ সম্পর্কে জানা প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর ফরয। কেননা কোন্ কোন্ কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তা না জানলে শিরক থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সমাজে প্রচলিত কিছু শিরকের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. اَلرِّيَا বা লোক দেখানো আমল গোপন শিরক

اَلرِّيَا (আর রিয়া) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা ইত্যাদি। শরীয়াতের পরিভাষায় রিয়া হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় করা অথচ নিয়ত থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করা অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদাত বা ভালো কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا﴾

যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহফ- ১১০)

হাদীসে এসেছে,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য যাকাত দিল সে শিরক করল।[৮০]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোপন শিরক হলো কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য আমল করে।[৮১]

রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্কবাণী :

রিয়ার অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। নবী ﷺ তাঁর উম্মতের ব্যাপারে অন্য কিছুর চেয়ে রিয়াকে বেশি ভয় করেছেন। হাদীসে এসেছে,

---

[৮০] মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হা/৬৯৯৩।

[৮১] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৭৯৩৬।

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ . أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ . يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ : اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের জন্য যে বিষয়টি আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, রিয়া তথা লোক দেখানো আমল। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের পুরস্কার দান করবেন তখন তাদেরকে বলবেন, তোমরা তাদের কাছে যাও, দুনিয়াতে তোমরা যাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করতে। অতঃপর দেখো! তাদের কাছ থেকে কিছু পাও কিনা।[৮২]

এটি দাজ্জালের ফিতনা থেকেও মারাত্মক :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ . قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ . فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : بَلٰى . فَقَالَ : اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ . أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ . فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ . لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আমরা মাসীহে দাজ্জালকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট মাসীহে দাজ্জাল থেকেও বেশি ভয়ের বিষয় কোনটি তা কি বলব? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, গোপন শিরক। যেমন– কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াল এবং তা সুন্দর করে আদায় করতে থাকল, যাতে কোন লোক তাকে লক্ষ্য করে। আর এটাই হলো গোপন শিরক।[৮৩]

২. তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরক

আল্লাহই একমাত্র ভালো ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, রোগ থেকে মুক্তিদাতা ও সন্তানদাতা। তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে এসব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর উপর নির্ভর করা হয়, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা (সুতা) ইত্যাদি পরিধান করাও শিরক। যেমন- বিভিন্ন ফকীরের তাবিজ, খাজা আজমিরী দরবারের লাল কিংবা সাদা-কালো সুতা হাতে বাঁধা, দরবারী তাবিজ, বড় হুজুর বা ছোট হুজুরের তাবিজ, ইমাম সাহেবের তাবিজ,

[৮২] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪০৩০।

[৮৩] ইবনে মাজাহ, হা/৪২০৪।

পীরের তাবিজ, অষ্টধাতুর আংটি, বিভিন্ন পাথরের আংটি ইত্যাদি। এসব বস্তুর উপর নির্ভরশীল আকীদা-বিশ্বাস শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট চান, তবে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তবে কি তারা সে অনুগ্রহকে বন্ধ করতে পারবে? (সূরা যুমার- ৩৮)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ عَلٰى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً . فَقَالَ : وَيْحَكَ مَا هٰذِهٖ ؟ قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির বাহুতে রূপার একটি রিং দেখতে পেয়ে বললেন, ওহে হতভাগা! এটা কী? লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা কেবল তোমার দুর্বলতাকেই বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হবে না।[৮৪]

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ الرُّقٰى . وَالتَّمَائِمَ . وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ : قُلْتُ : لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِيْ فَإِذَا رَقَانِيْ سَكَنَتْ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهٖ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا . إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ أَنْ تَقُوْلِيْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ . اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ . لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

আবদুল্লাহ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় মন্ত্র, তাবিজ-কবজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তখন আমি বললাম, তুমি এটা কী বলছ? আল্লাহর শপথ! তখন আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। কেননা আমি এক ইয়াহুদির কাছে ঝাড়ফুঁক নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। অতঃপর সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলে আমার অসুস্থতা ভালো হয়ে গিয়েছিল। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। শয়তান তার হাতে এটা করায়। তারপর যখন মন্ত্র ফুঁকে দেয় তখন সে সরে যায়। তোমার জন্য যথেষ্ট হলো এভাবে দু'আ করা যেভাবে নবী ﷺ দু'আ করতেন।

[৮৪] মুসতাদরাকে হাকেম হা/৭৫০২, সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬০৮৫।

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ . اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ . لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থাৎ হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ অসুস্থতা দূর করে দাও। তুমি আরোগ্য দান করো, কারণ তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোন আরোগ্য নেই। তুমি এমন আরোগ্য দান করো, যাতে অন্য কোন অসুস্থতা অবশিষ্ট না থাকে।[৮৫]

৩. শুভ-অশুভ লক্ষণ বা সংকেত গ্রহণ করা শিরক

ভালো ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিপদ এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিসের উপর অর্পণ করা শিরক।

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَحَّرَ اَوْ تَسَحَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, যে ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে এবং যার উদ্দেশ্যে করা হয়, যে তিয়ারা বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে বা যার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়, তারা কেউ আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৬]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ. قَالَ : فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ . قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ

মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আস সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আমরা জাহেলী যুগে কতগুলো কাজ করতাম যেমন গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না! জ্যোতিষীদের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমরা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ সংকেত নির্ধারণ করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তোমরা নিজেরাই তৈরি করেছ, এটা যেন তোমাদের কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে।"[৮৭]

অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এসব সংকেত মানুষের কল্পনাপ্রসূত বানানো গল্প, যার কোন বাস্তবতা নেই।

কাঠে টোকা দেয়া, লবণ উল্টে পড়া, আয়না ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ঝাড়ু, খালি কলসি, তের নম্বর সংখ্যা ইত্যাদি অশুভ লক্ষণ মনে করা শিরকী আকীদা। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

---

[৮৫] আবু দাউদ, হা/৩৮৮৫।

[৮৬] মুজামুল আওসাত, ৪/৩০২।

[৮৭] সহীহ মুসলিম হা/৫৯৪৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ . فَقَدْ أَشْرَكَ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ . مَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَقُوْلَ أَحَدُهُمْ : اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ . وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ . وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কেউ তিয়ারার (কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণার) কারণে কোন কিছু থেকে বিরত থাকল, সে শিরক করল। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর প্রায়শ্চিত্ত কী? তিনি উত্তর দিলেন, বলো! "আল্লা-হুম্মা লা-খাইরা ইল্লা খাইরুক, ওয়া লা-ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুক, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি প্রদত্ত অমঙ্গল ব্যতীত কোন অমঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।[৮৮]

৪. 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা শিরক

عَنْ قُتَيْلَةَ . اِمْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ : أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ . وَتَقُوْلُوْنَ : وَالْكَعْبَةِ ؟ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوْا أَنْ يَحْلِفُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . وَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ

জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা সাহাবী কুতাইলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা একজন ইয়াহুদি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন। কারণ আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন, কা'বার কসম (এগুলো তো স্পষ্ট শিরক)। এরপর নবী ﷺ বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে কা'বার রবের কসম। আর বলবে, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন।[৮৯]

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : مَا شَاءَ اللهُ . وَشِئْتَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَجَعَلْتَنِيْ وَاللهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর উদ্দেশ্যে বলল, আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন (তাই হয়েছে)। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললে? বরং আল্লাহ যা এককভাবে ইচ্ছা করেছেন (তাই হয়েছে)।[৯০]

---

[৮৮] মুসনাদে আহমাদ হা/৭০৪৫।

[৮৯] সুনানে নাসাঈ হা/৩৭৭৩।

[৯০] মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৩৯, সুনানে বায়হাকী হা/৫৬০৩।

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَأٰى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . فَقَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ . تَقُوْلُوْنَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . وَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ . إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ . قُوْلُوْا : مَا شَاءَ اللهُ . ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তিনি একজন আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন সে তাকে বলল, তোমরা কতই না উত্তম সম্প্রদায়! যদি তোমরা শিরক না করতে। তোমরা বলে থাক যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা ইচ্ছা করেছেন। অতঃপর তিনি বিষয়টি নবী ﷺ এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমি জানতাম তবে তোমাদেরকে এ কথা বলার আদেশ দিতাম যে, তোমরা বলো, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ যা ইচ্ছা করেন।[৯১]

৫. বিপদকালে لَوْ বা 'যদি' শব্দের ব্যবহার শিরক

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ . وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ . اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ . وَاسْتَعِنْ بِاللهِ , وَلَا تَعْجَزْ . فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ . فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . وَلٰكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ . وَمَا شَاءَ فَعَلَ . فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শক্তিশালী মুমিন উত্তম। আর আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনই উত্তম। তবে উভয়ের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। অতএব যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না– 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বলো, আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়। অর্থাৎ 'যদি' শব্দটি শয়তানের চাবি।[৯২]

---

[৯১] সুনানে ইবনে মাজাহ হা/২১১৮; সুনানে দারেমী হা/২৭৫৫।

[৯২] সহীহ মুসলিম হা/৬৯৪৫, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৭৯, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭৯১।

৬. মৃত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা শিরক

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ﴾

ঐ লোকের চেয়ে বেশি গোমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামতের দিন পর্যন্তও কোন সাড়া দেবে না। বরং তাদেরকে যে ডাকা হয়েছে, সে কথা তারা জানেই না। (হাশরের ময়দানে) যখন সব মানুষকে একত্র করা হবে, তখন তারা যাদেরকে ডাকত তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ- ৫, ৬)

﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ - اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ﴾

যারা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করে তারা তা প্রদানে সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, তবে তারা তোমাদের আহ্বান শুনতে পাবে না। আর যদিও শুনতে পায় তবুও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক করাকে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে না। (সূরা ফাতির- ১৩, ১৪)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কথা বলেছেন এবং আমি তার সাথে আরেকটি কথা যোগ করলাম। নবী ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর শরীক হিসেবে না ডেকে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৩]

কবরবাসীরা জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম :

﴿اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ﴾

তুমি তো মৃতকে কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও কোন আহ্বান শুনাতে পারবে না যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। (সূরা নামল- ৮০)

যারা কথা শুনে না তারা কীভাবে অপরকে সাহায্য করবে, অপরকে সান্ত্বনা দেবে এবং অপরের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করবে? বরং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত।

---

[৯৩] সহীহ বুখারী হা/৪৪৯৭।

৭. মাযার-দরগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِيْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِيْ ذُبَابٍ , مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوْا عَلٰى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوْا : لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ اَحَدٌ اِلَّا قَدَّمَ شَيْئًا . فَقَالُوْا لِاَحَدِهِمَا : قَدِّمْ شَيْئًا . فَأَبٰى فَقُتِلَ . وَقَالُوْا : لِلْاٰخَرِ : قَدِّمْ شَيْئًا , فَقَالُوْا : قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا . فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابٌ , فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ . فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهٰذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِيْ ذُبَابٍ . وَدَخَلَ هٰذَا النَّارَ فِيْ ذُبَابٍ

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। (ঘটনাটি হলো) একদা দুব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর ঐ গোত্রটির একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। (মূর্তির খাদেমরা) প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি কিছু দিয়ে যাও। লোকটি অস্বীকার করল ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর তারা দ্বিতীয় জনকে বলল, কিছু দিয়ে যাও। তারা আবার বলল, একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সে বলল, মাছি দ্বারা কী হবে? পরিশেষে সে একটি মাছি দান করল, অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সালমান (রাঃ) বলেন, এই হলো এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল (এর ব্যাখ্যা)।[১৪]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল গাইরুল্লাহর নামে কোন কিছু দান করা বা ভোগ দেয়া শিরক।

৮. মৃত ব্যক্তিকে অসীলা বানানো শিরক

মৃতদেরকে অসীলা বানানো, তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া অথবা সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কাজসমূহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অসীলার অর্থ হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া, যা কেবল ঈমান এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দু'আ করা আল্লাহ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর এবং তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

আর তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যারা তোমার কোন উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। যদি এটা কর তাহলে তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস- ১০৬)

---

[১৪] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা/৩৩৭০৯, বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান হা/৭৩৪৩।

৯. মাযারে বা ওরসের নামে যবেহ করা শিরক

পশু যবেহ করা ও দান-সাদাকা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এগুলো যখন আল্লাহর নামে করে তখন আল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য হয়, আর যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর নামে করা হয় তখন তা গাইরুল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য হয়। আর গাইরুল্লাহর ইবাদাত করাই শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে (নিবেদিত)। (সূরা আন'আম- ১৬২, ১৬৩)
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

তুমি নামায কায়েম করো এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) কুরবানী করো। (সূরা কাওসার- ২)

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ

আবু তুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রাঃ) কে অনুরোধ করলাম যে, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বলুন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র আপনার কাছে গোপন রেখেছেন। আলী (রাঃ) বললেন, না! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে এমন কিছু বলেননি, যা অন্যের থেকে গোপন করেছেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চারটি বিষয়ে বলতে শুনেছি, (ক) যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লানত। (খ) যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। (গ) যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। (ঘ) যে ব্যক্তি জমির সীমানা (চিহ্ন) পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লানত।[৯৮]

১০. নেককারদের কবরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা শিরক

নেককারদের কবরের ব্যাপারে অনেকে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এ সীমালঙ্ঘন অনেক সময় শিরকের পর্যায়ে পড়ে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

---

[৯৮] সহীহ মুসলিম হা/৫২৪০।

আত্বা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না, যার ইবাদাত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গযব নাযিল হয়েছে, যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।[৯৬]

১১. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক

আশ্রয় কামনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার মালিক। এ জন্য সূরা নাস এবং ফালাকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় চাওয়ার নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করে, ফলে তারা নিজেদের সীমালঙ্ঘন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। (সূরা জিন- ৬)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

খাওলা বিনতে হাকীম আস সুলামিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতরণ করে বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[৯৭]

১২. বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া শিরক

বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া ও সুতা বাঁধা শিরক। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلٰى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ . فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ . اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى ﴿اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ﴾ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

---

[৯৬] মুয়াত্তা ইমাম মালেক হা/৪১৪, মুসনাদে আহমাদ হা/৭৩৫২; মুসনাদে আবু ই'আলা, হা/৬৬৮১; মুসনাদে বাযযার, হা/৯০৮৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা/১৫৮৭।

[৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫৪।

আবু ওয়াক্বেদ আল লাইছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ ছিল, যাকে 'যাতে আনওয়াত' বলা হতো। এতে তারা তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি 'যাতে আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন যেমনিভাবে তাদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ পবিত্র ও মহান! এটা এমন একটি উক্তি যেমনটি মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায় করেছিল। তারা বলেছিল, "আপনি আমাদের জন্য একজন মাবুদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মাবুদ রয়েছে।" ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই তোমরা পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করতে থাকবে।[৯৮]

১৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ وَلَا بِاٰبَائِكُمْ

আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাগুতের নামে ও বাপ-দাদার নামে কসম করো না।[৯৯]

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوْا اِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللهِ اِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে কসম করো না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করো না। আর আল্লাহর নামে সত্য কসম ব্যতীত কসম করো না।[১০০]

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

সা'দ ইবনে উবায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই বলে কসম করতে শুনলেন যে, 'না- বরং কাবার কসম!' তখন ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল সে অবশ্যই শিরক করল।[১০১]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে যেমন- কুরআন মাজীদ নিয়ে, মক্কা-মদিনার নামে, মসজিদের নামে, দরগা-মাযারের নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

[৯৮] সুনানে তিরমিযী হা/২১৮০।

[৯৯] সহীহ মুসলিম হা/৪৩৫১, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/২০৯৫।

[১০০] সুনানে আবু দাউদ হা/৩২৫০, সুনানে নাসাঈ হা/৩৭৭৮।

[১০১] সুনানে তিরমিযী হা/১৫৩৫, সুনানে আবু দাউদ হা/৩২৫৩, মুসনাদে আহমদ হা/৬০৭২।

১৪. নবী ﷺ কে নূরের তৈরি মনে করা শিরক

এক শ্রেণির মানুষ বলে, নবী ﷺ কে তৈরি না করলে আল্লাহ কোনকিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ ব্যাপারে তারা যে হাদীসটি বলে তা একটি জাল বা বানোয়াট হাদীস। তারা আরো বলে আল্লাহ নবী ﷺ কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরি করেছেন, নবী ﷺ নূরের তৈরি। আর নবী ﷺ এর নূরে সমস্ত জগৎ তৈরি। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নবী ﷺ কে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকে। কারণ এতে আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যা তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন। (সূরা কাহফ- ১১০)

আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ কে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট ওহী আসে।

মুহাম্মাদ ﷺ অন্যান্য মানুষের মতোই আদম সন্তান ছিলেন। মানুষ যেমন পানাহার করে, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺও পানাহার করতেন। অন্যান্য মানুষের যেমন সন্তানাদি ছিল, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এরও সন্তানাদি ছিল, স্ত্রীও ছিল। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

নিশ্চয় আমি মানুষ, আমি তোমাদের মত ভুলে যাই। যদি আমি ভুলে যাই তবে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।[১০২]

তাছাড়া অন্যান্য মানুষের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ এরও বংশ তালিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ তালিকা হলো,

মুহাম্মাদ ﷺ আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, তিনি হাশেমের পুত্র, হাশিম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ কেনান বংশের, কেনান আরব বংশোদ্ভুত, আরবগণ ইসমাইলের বংশধর, ইসমাইল ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধর, ইবরাহীম নূহ (আঃ) এর বংশধর, নূহ (আঃ) আদম (আঃ) এর বংশধর, আর আদম (আঃ) হলেন মাটির তৈরি মানুষ। সর্বোত্তম মানব বংশেই তাঁর জন্ম। মানব পিতামাতার মানব শিশু হিসেবেই তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছেন। মাটির তৈরি মানুষের জন্য মাটির তৈরি রাসূল প্রেরণই ছিল মহান আল্লাহর নীতি। মানবজাতির জন্য প্রেরিত কোন রাসূলই মানবজাতির বাহির থেকে আসেননি। এ হচ্ছে কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী আকীদা।

---

[১০২] সহীহ মুসলিম হা/১৩০২, সুনানে আবু দাউদ হা/১০২২, সুনানে নাসাঈ হা/১২৪৩, মুসনাদে আহমদ হা/৪১৭৪।

১৫. রাসূল ﷺ কে হাযির-নাযির মনে করা শিরক

একদল মানুষ নবী ﷺ এর নামে মিলাদ নামক বিদআত অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে মিলাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং ধারণা করে যে, নবী ﷺ এর রূহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে– তাই দাঁড়াতে হয়। অথচ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর একদল ফেরেশতা নির্দিষ্ট রয়েছে, যারা পৃথিবীময় বিচরণ করে আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছায়।[১০৩]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলাদ মাহফিলসহ অন্য কোথাও হাযির হন না। কেননা সর্বত্র যিনি তাঁর ইলিম ও জ্ঞানের মাধ্যমে হাযির-নাযির তিনি হচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেও হাযির-নাযির মনে করা আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

১৬. কাউকে ইলমুল গায়েবের অধিকারী মনে করা শিরক

ইলমুল গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। নবী-রাসূল, জিন-ফেরেশতা, ওলী-আওলিয়া কেউই আলেমুল গায়েব নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

বলো, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন উত্থিত হবে? (সূরা নামল- ৬৫)

অতএব গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ জ্ঞান নবী ﷺ এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শিরক হবে। নবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র ততটুকুই জ্ঞান রাখেন যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ﴾

তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। (সূরা জিন- ২৬, ২৭)

১৭. আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান– এ ধারণা শিরক

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ বিশ্বাস 'তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত' এর বিপরীত শিরকের একটি রূপ। কারণ এটা স্রষ্টার জন্য এমন এক বিশেষণ দাবি করে, যা তাঁর নয়।

---

[১০৩] সুনানে নাসাঈ হা/১২৮২, মুসনাদে আহমদ হা/৩৬৬৬, মুসতাদরাকে হাকেম হা/৩৫৭৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা/৮৭৯৭, সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯১৪।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র বিরাজমান না হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে মেরাজের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার দুই বৎসর পূর্বে মক্কা হতে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইসরা) করেন এবং সেখান হতে মেরাজ ভ্রমণ করেন অর্থাৎ সাত আসমানের উপর সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমন করেন। যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কোথাও যেতে হতো না। তিনি নিজের বাড়িতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে পারতেন। সুতরাং এ ঘটনাটি একটি প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি আরশে সমাসীন।

১৮. ভাগ্য গণনা করা শিরক

মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে, যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। তারা বিভি নামে পরিচিত যেমন- গণক, ভবিষ্যতবক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাসদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবি করে। যার মধ্যে রয়েছে, চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন করা, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হাড়গোড়, লাঠি চালনা, বাটি চালান ইত্যাদি।

এদের মধ্যে অনেকে আছে, যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা কোন গুপ্ত বিষয় জানা নেই। তারা অনুমান করে অনেকগুলো কথা বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান সত্য হয়ে যায়। বেশির ভাগ লোক যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখে আর যেগুলো সত্য হয় না তার বেশিরভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। আবার এদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। যারা এ কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি নির্ভুল হয়। এদের কথা বিশ্বাস করলে আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করা হয়। ফলে এটি 'তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত' কে অস্বীকার করে।

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় বরং জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের বই কেনা অথবা কারো কোষ্ঠী যাচাই সম্পূর্ণ নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেহেতু যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

সাফিয়্যা (রাঃ) নবী ﷺ এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত গৃহীত হবে না।[১০৪]
এটা হলো জ্যোতিষীর কাছে শুধু যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি। আর যে তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করল সে আরো বড় ধরনের অপরাধ করল।

১৯. মানুষের তৈরি আইন মানা শিরক

মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়া শিরক। একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কেননা এ সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তখন তারা তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দ্বিধায় মানতে বাধ্য থাকে। আর এভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত আদেশগুলোর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রাধান্য পায়। এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। যেসব মানুষ আল্লাহর নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাগুত বলে সাব্যস্ত করেছেন।
মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শিরক। এতে কোন সন্দেহ নেই।[১০৫]

একনজরে কতিপয় শিরক

১. কোন ব্যক্তি বিশেষের মূর্তি তৈরি করা কিংবা কোন নেতা-নেত্রীর অথবা কোন অলী-আওলিয়া বা বুযুর্গের প্রতিকৃতি কিংবা ছবিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে প্রাণবস্তু মনে করা এবং তা ঘরে অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা।
২. কোন ওলী-আওলিয়া বা বুযুর্গের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা বা তাঁরা কাউকে সাহায্য করতে পারে বলে বিশ্বাস করা এবং কোন পীর বা ওলী-আওলিয়াকে 'গাউছুল আজম' বা 'গাউছে মুখতার' আখ্যায়িত করা।
৩. মনের নিয়ত পূর্ণ হওয়া বা কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কোন মুরব্বীর কবরে কিংবা ওলী-আওলিয়া বা বুযুর্গের মাযারে বা দরবারে যিয়ারত করতে যাওয়া কিংবা কোন মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে কোন উদ্যোগ বা কোন শুভ

---

[১০৪] সহীহ মুসলিম হা/৫৯৫৭, মুসনাদে আহমদ হা/১৬৬৩৮।
[১০৫] আদওয়া উল-বায়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫।

কাজের উদ্বোধন কিংবা যাত্রা শুরু করা এবং মাযারে বা দরবারে টাকা-পয়সা, ছাগল, গরু, মহিষ, ইত্যাদি হাদিয়া দেয়া বা দান করা শিরকী কাজ।

৪. কোন ওলী-আওলিয়া বা বুযুর্গ কিংবা কোন পীর-ফকীর কোন নিঃসন্তানকে সন্তান অথবা ছেলের স্থলে মেয়ে বা মেয়ের স্থলে ছেলে দিতে পারে বলে মনে করা একটি বড় শিরক। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

৫. মাযারে গিয়ে যিয়ারত শেষ করে মাযারকে পিঠ না দিয়ে পেছনে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসা এটাও একটা শিরক। কারণ মাযারকে পিঠ দিয়ে আসা হয় না এ বিশ্বাসে যে, মাযারের বুযুর্গ যেহেতু তাকে দেখছেন, সেহেতু সে তাকে কীভাবে পিছ দিতে পারে। অথচ কোন মৃত বুযুর্গ কাউকে দেখছেন এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ শিরকী বিশ্বাস।

৬. কবরে বা মাজারে কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সিজদা করা সুস্পষ্ট শিরক এবং কাউকে সম্মানের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকানোও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে কোন প্রকার সিজদা করা যায় না। সিজদা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর জন্য ব্যতীত আর কারো নিকট মাথা ঝুঁকানো হারাম।

৭. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত কোন আওলিয়া বা বুযুর্গের নামে কিংবা কোন দরগাহ বা মাযারের নামে মান্নত মানাও শিরক।

৮. যে কাজ বা কথা আল্লাহ তা'আলার জন্যই শোভা পায় তা অন্যের ক্ষেত্রে বলা, কোন ওলী-আওলিয়া বা বুযুর্গের নামের অসীলা দেয়া। যেমন- অমুক আওলিয়ার অসীলায় মামলা-মোকাদ্দমায় জেতা হয়েছে, অমুক বুযুর্গের অসীলায় পরীক্ষায় ভালো করা হয়েছে, খাজা বাবার অসীলায় প্রতিপত্তি লাভ হয়েছে। আবদুল কাদের জিলানীর অসীলায় এমন হয়েছে তেমন হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জাতীয় অসীলায় কথা বলাও শিরক। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাপারে আল্লাহর মেহেরবানী লাভ করার পর তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় না করে তাঁর কৃতিত্বটি অন্য কাউকে দেয়া আল্লাহর উপর চরম অত্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১০৬]

৯. জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভের লক্ষ্যে শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন কিংবা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো।

প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত কাজসমূহে কোন কল্যাণ বা সমৃদ্ধি নেই। বরং সকল কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উৎস হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে।[১০৭]

১০. জনগণকেই ক্ষমতার উৎস মনে করা এটা একটি শিরকী আকীদা। প্রকৃতপক্ষে জনগণ কোন ক্ষমতার উৎস নয়। বরং জনগণ ক্ষমতার মাধ্যম। ক্ষমতার উৎস বা এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।[১০৮]

---

[১০৬] সূরা ফাতির- ১৩, ১৪; সূরা নিসা- ৪৮; সূরা লুকমান- ১৩; সূরা নহল- ৫৪।

[১০৭] সূরা আলে ইমরান- ১২৬।

[১০৮] সূরা বাকার- ১৬৫; সূরা আলে ইমরান- ২৬।

শেষ জমানায় কীভাবে ঈমান রক্ষা করতে হবে?

عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ. اَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ. يَقُوْلُ : كَانَ النَّاسُ يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ. وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَنْ يُدْرِكَنِيْ. فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ. فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَفِيْهِ دَخَنٌ . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ دُعَاةٌ اِلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ . مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا . قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا . وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ . قُلْتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا . وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ আশংকায় যে, আমার জীবনেই তা শুরু হয়ে যায় কিনা। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন। এ কল্যাণের পর আবার কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে কিছু কলুষতা থাকবে। আমি বললাম, সে কলুষতার স্বরূপ কী হবে? তিনি বললেন, সে কলুষতার স্বরূপ হবে এই যে, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ শরীয়াত সম্মত হবে আবার কোন কোন কাজ শরীয়াত বিরোধী হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাসমূহের দিকে বহু আহ্বানকারী লোকদেরকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাবে তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কী? তিনি বললেন, তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং তারা আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, ঐ অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে অর্থাৎ যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে তখন কী করতে বলেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের দল ও ইমাম না থাকে? তিনি জবাব দিলেন, তবে তোমাকে যদি গাছের মূল খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয় তবুও তুমি তাদের সকল দল হতে দূরে থাকবে, এমনকি এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ মরণকে বরণ করে নেবে তবুও পথভ্রষ্টদের দলে যোগ দেবে না।[১০৯]

---

[১০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৬০৬; সহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯০; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৭২৪৪।

ইমাম পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ

ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা